KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর ওসমান
Title চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number ৫৫/১ ৫৫/২ ৫৫/৩ ৫৫/৪	Year of Publication : শ্রাবণ ১৪০১ কার্তিক ১৪০১ মাঘ ১৪০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০২
	Condition : Brittle / Good (✓)
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Rol. No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ১ শ্রাবণ ১৪০১

রবীন্দ্রসমালোচনার বিভিন্ন ধরন পর্যালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচকের প্রকৃত দায় এবং দায়িত্ব নিয়ে গভীর মনোগ্রাহী বিশ্লেষণ উপস্থাপনা করেছেন শঙ্খ ঘোষ।

বিশিষ্ট রবীন্দ্রসমালোচক দেবদাস জোয়ারদার লিখেছেন তথ্য এবং বিশ্লেষণসমৃদ্ধ সন্দর্ভ —"রবীন্দ্রনাথ কি শেষ পর্যন্ত নাস্তিক হয়ে উঠেছিলেন ?"

দুরূহ বিষয়কে প্রাঞ্জল করে তোলার অনবদ্য ক্ষমতার অধিকারী অর্থনীতিবিদ ধীরেশ ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, "গ্যাট ও ভবিষ্যতের পথনির্দেশ" শীর্ষক প্রবন্ধ।

সম্প্রতি বাংলাদেশের গ্রাম-শহরে ঘোরার অভিজ্ঞতা এবং প্রচুর তথ্যের ভিত্তিতে সেখানকার সংখ্যালঘুদের প্রকৃত অবস্থা ও সেদেশের বিত্তশালীদের সামাজিক ভূমিকা প্রসঙ্গে অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ উপস্থাপনা করেছেন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম', জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাসংকলন এবং জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ নিয়ে আলোচনা করেছেন যথাক্রমে ড. ভবতোষ দত্ত, ড. মীনাক্ষী ঘোষ এবং শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

স্ট্যান্ডার্ড বাংলা উচ্চারণ বিধিবদ্ধ করার সমস্যা নিয়ে অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা।

ভূপর্যটক রমানাথ বিশ্বাস শতবার্ষিকী স্মরণিকা লিখেছেন বারিদবরণ ঘোষ।

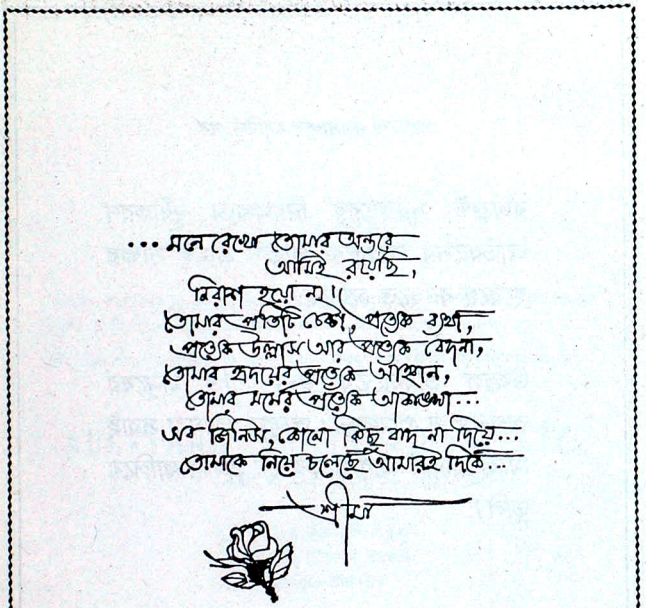

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ১
শ্রাবণ ১৪০১

লেখা আর তার লেখক শঙ্খ ঘোষ ১
রবীন্দ্রনাথ কি শেষপর্যন্ত নাস্তিক হয়ে উঠেছিলেন দেবদাস জোয়ারদার ১০
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, গ্যাট ও ভবিষ্যতের পথনির্দেশ ধীরেশ ভট্টাচার্য্য ২৪
পুনশ্চ বাংলাদেশ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮

কবিতা

দুটি সনেট আল মাহমুদ ১৬
বাড়িটির নাম জলপ্রপাত আনন্দ ঘোষ হাজরা ১৭
কালান্তর পরিমল চক্রবর্তী ১৮
পরিহাস গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
প্রভুত্ব রেজাউদ্দিন স্টালিন ২০
বিভূতিভূষণ মতি মুখোপাধ্যায় ২১
ধ্বনিময় জন্মদিন মঞ্জুভাষ মিত্র ২২
অস্তিত্বের মহড়া রবিউল হুসাইন ২৩

গল্প

গগনচটি সন্তোষ কুমার দে ২৯
নয়নাংশু শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় ৩১

গ্রন্থ সমালোচনা

ভবতোষ দত্ত ৫৩ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৫ মীনাক্ষী ঘোষ ৫৭
বিজলি সরকার ৫৯ তিমির বসু ৬১ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ৬৩

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস জন্মশতবার্ষিকী বারিদবরণ ঘোষ ৬৫
রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি কমলাকান্ত বরাট ৬৮

মতামত

প্রসঙ্গ ধর্ম ও রাজনীতি (১) ৭০ প্রসঙ্গ ধর্ম ও রাজনীতি (২) ৭১ বদরুদ্দীন উমরের পত্র ৭১
'উজ্জ্বল একঝাঁক শায়রা'-র লেখক মৌমাছি নয় ৭১

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক গুপ্ত প্রেস, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত
এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—১৩ দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭
শিল্প পরিকল্পনা রণেন আয়ন দত্ত নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

With Best Compliments from :

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED

CIVIL / STRUCTURAL ENGINEERS, CONTRACTORS,
MASTER DREDGERERS & PROMOTERS

REGISTERED OFFICE :
59 / B, CHOWRINGHEE ROAD,
(5TH FLOOR)
CALCUTTA- 700 020

PHONE: 40-3165, 40-3093
Telex : 021-4151 DTMC IN

লেখা আর তার লেখক

শঙ্খ ঘোষ

কাল রাত্রে কি কোনো কবিতা পড়েছেন আপনি? কিংবা এই সাতদিনের মধ্যে কখনো? একমাসের মধ্যে? এমনকী, গত ছমাসে, না-জানা নতুন কোনো কবিতা? দেশ পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখা বা দূরদর্শন আকাশবাণীতে আকস্মিক কোনো আবৃত্তি শুনবার কথা নয়, আমি বলছি পড়বার কথা, এমনি এমনি পড়া। পরীক্ষা নিতে হবে না, পরীক্ষা দিতে হবে না; ক্লাসে পড়াতে হবে না বা ক্লাসে পড়তে হবে না; কোনো সমালোচনা লিখতে হবে না আপনাকে; কিন্তু তবু, হঠাৎ কোনো বই টেনে নিয়ে একটা কবিতা পড়ে ফেলা? হয়তো-বা মন ভালো নেই আপনার, জীবনকে মনে হচ্ছে দুঃসহ, দিশেহারা দিনগুলি কীভাবে কাটাবেন তা ভেবে উঠতে পারছেন না, এমন কোনো মুহূর্তে কি পড়বার ইচ্ছে হয়েছে কোনো কবিতা? কিংবা হয়তো কোনো নতুন আবেগে ভরে গেছে বুক, পৃথিবীর সবকিছুকেই মনে হচ্ছে সজল সুন্দর মায়াময়, সমস্ত শরীর দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করছে এর সমস্ত বিন্দু, আর সবারই দিকে হাত বাড়াতে ইচ্ছে করছে সখের, কোনো কবিতারও কথা কি মনে হয়েছে তখন? আপনার সামনে ভেঙে পড়তে দেখেছেন শতাব্দীজোড়া ভরসাজাগানো কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা, আপনার সামনে গড়ে উঠতে দেখেছেন ভবিষ্যমুখী ব্যাপক কোনো সমাজ-আন্দোলন, সেই মুহূর্তে কোনো কবিতাকেও কি ছুঁতে চেয়েছেন আশ্রয়ের মতো, প্রশ্রয়ের মতো?

এর কোনো-কোনোটির উত্তরে (নিজের কাছে নিজে উত্তর দেন যদি) কেউ কেউ হয়তো বলবেন 'হ্যাঁ', অনেককে তবু 'না'-ই বলতে হবে, সত্যের মুখোমুখি যদি হতে চান তিনি। একটু ভাবিত হয়ে অনেকে হয়তো লক্ষ করবেন যে দিনের পর দিন কোনো কবিতার দিকে এগোতে হয়নি তাঁদের, কিন্তু তাতে যে জীবন অচল হয়ে গেছে এমন নয়। না এগোবার একটা কারণ অনেকসময়ে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের পরে যেসব কবিতা লেখা হয়েছে বাংলায়, লেখা হচ্ছে আজও, তার দুরূহ চরিত্রই দূরে সরিয়ে রাখে পাঠককে, এমন একটা অনুযোগ ধ্বনিত হতে শোনা যায়। এ-অনুযোগের সত্যাসত্য নির্ধারণ আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই প্রশ্নটা তুলতে হবে প্রথমেই, রবীন্দ্রনাথকেও কি আমাদের দরকার হয় সত্যি সত্যি? তাঁকেও কি পড়ি আমরা ঠিকমতো?

'পড়িই তো।' এইরকমই মনে হবে প্রথমে। আমাদের আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের নাম এমনইভাবে ছড়ানো থাকে যে আমরা ধরেই নিই আমরা রবীন্দ্রনাথের পাঠক। বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সমাজনৈতিক সমস্যার মুহূর্তে বারবার উঠে আসে রবীন্দ্রভাবনার কথা, তাঁর প্রবন্ধাবলির আংশিক উল্লেখ; সবসময়েই কোনো-না-কোনো দল অভিনয় করছে তাঁর কোনো-না-কোনো নাটকের; অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে আমাদের চর্চারও কোনো বিরাম নেই; আর আবৃত্তিজগতের সাম্প্রতিক প্রতাপে — "পৃথিবী" "আফ্রিকা" "এবার ফিরাও মোরে" "ওরা কাজ করে"র মতো কয়েকটি মাত্র কবিতার ছোটো গণ্ডি ছেড়ে — রবীন্দ্রনাথের আরো কিছু কবিতা শুনতে পাওয়া যায় এখন আবৃত্তিকারদের মুখে। কিন্তু আমার নিজেরই দরকারে নিজেরই প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছবার অভিজ্ঞতা — গান শোনা ছাড়া সেটা হয়তো আমাদের জীবনে কমই ঘটে।

নিয়মিত কবিতা পড়েন কারা? ছাত্রেরা পড়েন, শিক্ষকেরা পড়েন, সমালোচকেরা পড়েন। কিন্তু না, 'নিয়মিত' কথাটাও হয়তো-বা এখানে একটু বাহুল্য হলো। ক্লাস-নির্ধারিত বই যদি হয় 'বলাকা' তাহলে 'ছবি ও গান' বা 'আকাশপ্রদীপ'ও পড়বেন সমান মন নিয়ে, ছেলেমেয়েদের কাছে — এমনকী কখনো কখনো তাদের মাস্টারমশাইয়ের কাছেও এতটা আশা করা আজ সম্ভব নয় সবসময়ে। নিশ্চিতভাবেই পড়বার দরকার হয় যদি কোনো সমালোচনা লিখতে হয়। পড়বার জন্যই পড়ার অভ্যাসটা আমাদের এতই দূরবর্তী হয়ে গেছে যে হাতে বা টেবিলে কোনো বই দেখলে এ-প্রশ্নটা অনিবার্যভাবেই করে বসেন অনেকে: 'লিখছেন বুঝি কিছু?' অর্থাৎ, কোথাও কোথাও, বই-পড়াটা যেন হয়ে

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭, ২৮, ২৯ এপ্রিল তারিখে কাননবিহারী বক্তৃতামালায় পঠিত নিবন্ধের প্রথম দিনের অংশটি এখানে ছাপা হল। তিন-অংশে সম্পূর্ণ নিবন্ধটি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। 'লেখক লেখা পাঠক' শীর্ষক আলোচনার এই অংশটি পড়া হয়েছিল 'লেখক' শিরোনামে।

উঠেছে শুধু আরেকটা লেখার জন্য এক পদ্ধতিমাত্র, একটা উপাদান।

কিন্তু এই যে লেখা, কবিতা বা নাটক বা গল্প-উপন্যাস নিয়ে লেখা, যাকে আমরা সমালোচনা বলি, কার ঠিক কাজে লাগে সেটা ? রবীন্দ্রনাথেরই কবিতা বা গল্প বা নাটক নিয়ে এত-যে বইয়ের পর বই, লেখার পর লেখা, যাকে বলি রবীন্দ্র সমালোচনা, কারা তার পাঠক ? কবি যা লিখেছেন, পাঠক তা পড়েন (কিংবা পড়েন না)। মধ্যবর্তী এই সমালোচকেরা কী করেন ? এর প্রথম উত্তর নিশ্চয় এই যে সমালোচকেরাও পড়েন, তবে সেইখানেই থেমে না থেকে সেই পড়াটাকে তাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁরা আমাদের জানান কীভাবে তাঁরা পড়েছেন। আর দ্বিতীয় উত্তর, এই জানানোর সূত্রে, লেখকের সঙ্গে পাঠকের একটা সেতুবন্ধ তৈরি করে দেন তাঁরা। যে লেখকের লেখা (যেমন ধরা যাক কমলকুমার মজুমদার) কিংবা লেখকের যে-লেখা (যেমন ধরা যাক 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর "প্রতিধ্বনি") সবার কাছে খুব স্বচ্ছ লাগে না, সমালোচকের পড়বার পথটা জেনে হয়তো তাতে খানিকটা আলো লেগে যায়।

কোথায় লাগে আলো ? ঠিক জায়গায় তো ? এইসব প্রশ্ন তারপর একটু একটু করে উঠে পড়ে। আলোচনার লক্ষ্য ছিল যেটা, সেইদিকেই কি এগোতে চায় কলম, না কি ঘুরে মরে আরো নানা দেশে ? সরল সেতুপথ হয়ে উঠবার বদলে আমাদের আলোচনা কি ছমছমে এক রহস্যঘেরা দুর্গবাড়ি হয়ে ওঠে না, অনেকসময়ে ? অনুচ্চারিত এক 'তফাৎ যাও' 'তফাৎ যাও' ধ্বনি যেন জাগতে থাকে আমাদের লেখার থেকে, আমাদের পঠন বা পাঠনের পদ্ধতি থেকে, এগিয়ে আসবার বদলে তখন ভয়ে অনেকসময়ে পিছিয়ে যান পাঠক। আর এই রহস্যজট তৈরি করে তুলবার অনেকরকম পন্থার মধ্যে একটা হলো লেখককেই লেখার চেয়ে অনেক বড়ো করে দেখানো। আর অন্য একটা : লেখার চেয়ে অনেক বড়ো করে দেখানো তার লেখনকে।

২

চল্লিশ বছর আগে, তাঁর 'রবীন্দ্রসরণী' বইটি ছাপা হবার পর, একটা চিঠি লিখেছিলাম আমাদের মাস্টারমশাই প্রমথনাথ বিশীর কাছে। 'বলাকা'র অতিব্যবহৃত 'ছবি' কবিতাটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সে-বইয়ের পাদটীকায় তিনি লিখেছিলেন, কবিতায় উদ্দিষ্ট ছবিটি যে কার এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বা ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন সেটি কবিজায়ার ছবি, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বা প্রভাতকুমার বলেছেন কাদম্বরী দেবীর। নিজে এ-বিষয়ে স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে কেন তিনি এড়িয়ে গেলেন প্রসঙ্গটা, আর অতদিন পরেও ওই বিতর্কের কোনো তাৎপর্য আছে, না কি এতদিনে এটা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যাবার কথা, এই নিয়ে ছিল আমার জিজ্ঞাসা। ত্বরিত উত্তরে প্রমথনাথ লিখেছিলেন যে ছবি যাঁরই হোক, কবিতাটির আস্বাদনে তাতে কোনো ইতরবিশেষ ঘটে না — আর এটা বলবার পর, এই এক স্মরণীয় মন্তব্য তিনি করেছিলেন সেদিন : মনে রেখো, ডিটেকটিভগিরি করা সমালোচকের কাজ নয়।

সমালোচকেরা আর ডিটেকটিভেরা একইরকম সন্দিগ্ধ মনের মানুষ, 'রাজা' নাটক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আন্ড্রুজের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই ধিক্কার-বাক্য আমাদের মনে আছে। কিন্তু প্রমথনাথও ওই একই মর্মে আমাদের সতর্ক করতে চাইলে অন্য একটা প্রশ্ন মনে ওঠে। কবিতার পিছনে জীবনতথ্য খুঁজে বেড়ানোর যাথার্থ্যকেই তো ডিটেকটিভগিরি বলছেন তিনি ? ওটা যাঁরই ছবি হোক, তাঁর সঙ্গে তো এ-কবিতার অনেকখানি ইতিহাস জড়ানো থাকবার কথা ? সে-ইতিবৃত্ত না জানলেও কবিতাটি আমাদের কাছে যে তার পূর্ণতা নিয়েই পৌঁছতে পারে, অনেকে মনেও করতে পারেন সেটা। কিন্তু প্রমথনাথও কি পারেন তা ভাবতে ? সেই প্রমথনাথ, যাঁর সমালোচনা বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, 'তাঁরও প্রয়াস জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকর্ম মিলিয়ে দেখানো' আর সতর্ক করেছিলেন এই বলে যে 'এখানে সতর্ক না-হলে এমন বিষয় প্রশ্রয় পায়, যা সমালোচনায় অবৈধ, বা অবান্তর।' বুদ্ধদেব কি তবে ভুল বুঝেছিলেন প্রমথনাথকে ? তাও বলতে পারি না, কেননা বিশী তো নিজেই বলেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ'র ভূমিকায় : 'কবিমনকে বুঝিবার জন্যই কবির সম্পূর্ণ মনকে জানা প্রয়োজন — এবং এই সম্পূর্ণ মনকে জানিতে হইলে একই কালে লিখিত কাব্যের সঙ্গে পরিপূরকভাবে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও জীবনী মিলাইয়া আলোচনা করা আবশ্যক।' জীবনী ব্যবহার করেই যে কোনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তিনি, একথাও কবুল করেন প্রমথনাথ, পরে 'কাব্যনির্ঝর'-এর ভূমিকায় এও লেখেন যে, 'নিত্যনতুন জীবনতথ্য আবিষ্কার' করে রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগীদের কৃতজ্ঞ করছেন যাঁরা, তাঁদের কাছে তিনি বিশেষভাবেই ঋণী। তাহলে এর মধ্যে কি কোনো স্ববিরোধ আছে ? সাহিত্যবিচারে জীবনতথ্যের কাছে ঋণ স্বীকার করেও যদি কেউ বলেন, লেখার পিছনে কোনো ঘটনার বা কোনো ব্যক্তিসম্পর্কের টানাপোড়েনকে খুঁজে বেড়ানোটা নিছক ডিটেকটিভগিরি, তবে কি খুব সংগত লাগে সেটা ?

এই প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছবার আগে একটা কথা ভেবে দেখা ভালো। যাকে আমরা জীবনতথ্য বলে ভাবি, তারও আছে একটা বহির্মহল আর একটা অন্দরমহল। অন্দরমহলই বলছি এখানে, অন্তরমহল নয়, অন্তর্জীবন নয়। কোনো-একটা লেখার মুহূর্তে কোথায় ছিলেন লেখক, কী দেখছিলেন তাঁর চারপাশে, বাইরের সামাজিক-রাজনৈতিক জগতে যা-কিছু ঘটছিল তার সঙ্গে কতটুকু যোগ ঘটছিল তাঁর, কীভাবেই-বা ছিল সেই যোগ — এইসব

নিয়ে জীবনের একটা বাইরের চেহারা তৈরি হতে পারে। কিন্তু লেখকের যে-অংশটা অনেকখানি একান্তভাবে ব্যক্তি-মানুষ, তাঁর একেবারে নিজস্ব সুখ-দুঃখের প্রচ্ছন্ন দিক, নানারকম ব্যক্তিসম্পর্কের মধ্যে ভাঙাগড়ার নানা ইতিহাস, ক্ষয়ক্ষতিসংশয়ের শিউরেতোলা নানা ছোবল, এর মধ্যে আছে জীবনের অন্দর।

কাব্যবিচারে কাকে বলা যায় এই বহির্মহল আর অন্দরমহলের ঝোঁক, ছোটো একটা উদাহরণ সাজালে হয়তো তার একটা ধারণা হবে আমাদের। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি নিয়ে ছ'পৃষ্ঠার আলোচনা লিখেছিলেন একসময়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বিশ্ববোধ', 'অন্তর্গুহা', 'প্রাণলীলা', 'ঐকান্তিকী ভাবগতি' (এই শেষ কথাটা অবশ্য অজিতকুমার চক্রবর্তী থেকে নিয়েছিলেন তিনি) : এইসব শব্দ দিয়ে কবিতাটির অনেক ব্যাখ্যান করেন চারুচন্দ্র, এমন মন্তব্যও করেন যে এটি 'কবিপ্রতিভার আত্মজীবনচরিত', ফিক্‌টে থেকে ফাউস্ট পর্যন্ত অনেক বৈদেশিক সূত্রও তুলে আনেন লেখায়, 'মানুষের ধর্ম' বই থেকে এ-বিষয়ে কবির নিজস্ব বিশ্লেষণেরও একবার উল্লেখ করেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু তবু সদর স্ট্রিটের বারান্দার বিখ্যাত বর্ণনাটিকে কাজে লাগাবার কোনো দরকার হয় না তাঁর। অর্থাৎ, তাঁর দরকার নেই জীবনের তথ্যে। অথচ ওই একই কবিতা নিয়ে যখন কথা বলেন প্রমথনাথ বিশী, তিনি শুরুই করেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখবার এই 'ঘটনা' দিয়ে, এই 'অভিজ্ঞতা' দিয়ে, এমনকী এতটাই তিনি বলেন যে 'এই অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের একটি প্রধান ঘটনা, প্রধানতম ঘটনাও বলিতে পারা যায়', আলোচনার জন্য 'জীবনস্মৃতি' থেকে তার প্রাসঙ্গিক অংশ ব্যবহার করতে কখনোই তিনি ভোলেন না। চারুচন্দ্রের হাত দিয়েই 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি পৌঁছে গেছে 'প্রবাসী'র দপ্তরে, তাঁদেরই অনুনয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ওই বই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কবিতা-আলোচনায় চারুচন্দ্রের বিশেষ কাজে লাগেনি সেটি। আর প্রমথনাথকে পদে পদেই নির্ভর করতে হয়েছে এসব সূত্রের ওপর। কেননা এখানে আছে জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। বাইরের বর্ণনা থেকে সে-অভিজ্ঞতার একটা রূপ দেখা গেল। এইবার প্রমথনাথের কাজ শুধু সেই অভিজ্ঞতার মনের সঙ্গে কবিতার মনকে মিলিয়ে নিয়ে দেখা।

কিন্তু এখানেই থেমে যেতে যদি রাজি না হন কেউ ? যদি এই প্রশ্ন কেউ তোলেন : সদর স্ট্রিটের বাড়িতে ওই-যে হঠাৎ চেয়ে থাকতে থাকতে চোখের উপর থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল, কী উপায়ে গেল সেটা ? হঠাৎ কেন সেদিনটাকেই তাঁর মনে হল 'একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত' ? এত আনন্দ আর সুন্দরের অনুক্ত কোনো গোপন কারণও কি রয়ে গেছে কোথাও, যা একেবারে ব্যক্তিগত, আর ব্যক্তিগত বলেই অপ্রকাশ্য ? সেই অপ্রকাশ্যেরও খোঁজ নিতে গেলে তাকে বলা যায় জীবনের অন্দরমহলের খোঁজ।

সে-রকম খোঁজ কি নিতে চান কেউ ? অনেকেই আজ চান, অনেকেই আজ আর স্বপ্নে খুশি নন, জীবনের গল্প চান তাঁরা। সেই গল্পের খোঁজে, ওই একই কবিতা যখন পড়েন নীরদচন্দ্র চৌধুরী, তখন তিনি কবিতা থেকে 'জীবনস্মৃতি' এবং 'জীবনস্মৃতি' থেকে 'গোরা'র দিকে চলে যেতে চান, আর নির্মাণ করে তোলেন রবীন্দ্রনাথের এক অন্দর। তিনি দেখান, নিজের ভালোবাসার বিহ্বলতাকে গোরার সামনে খুলে ধরবার সময়ে বিনয় বলেছিল, 'মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে এক মুহূর্তে জাগ্রত করিবার উপায় এই প্রেম', বলেছিল 'কোনো কোনো মাহেন্দ্রক্ষণে নরনারীর প্রেমকে আশ্রয় করিয়া একটি অনির্বচনীয় অসামান্যতা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।' গোরা তখন নিজেরও হৃদয়ে ভালোবাসার আলোড়ন টের পায়, আর 'ছাদের উপর দাঁড়াইয়া পূর্বদিকের রক্তিম আকাশের দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস' ফেলে। এইটুকুই নয়, মিল আছে আরো। গোরাদের বাড়ির 'পূর্বপ্রান্তে একটা ইস্কুল আছে ; সেই ইস্কুলের সংলগ্ন জমিতে একটা পুরাতন জামগাছের মাথার উপরে পাতলা একখণ্ড সাদা কুয়াশা ভাসিতেছিল এবং তাহার পশ্চাতে আসন্ন সূর্যোদয়ের অরুণরেখা ঝাপসা হইয়া দেখা দিতেছিল।' কাজেই নীরদবাবু সিদ্ধান্ত করেন যে সদর স্ট্রিটের বারান্দা থেকে সূর্যোদয় দেখা, রবীন্দ্রনাথের মানসিক 'উলটপালট' বা তাঁর এক মুহূর্ত জাগ্রত হয়ে উঠবার আসল কারণ হলো গোরার মতোই তাঁর মনে কোনো প্রেমের আবির্ভাব, এবং সদর স্ট্রিটের বাড়িতেই যখন এই আবির্ভাব তখন প্রেমপাত্রীরও একটা ধারণা পাওয়া যায়। যুক্তিকে যথেষ্ট তথ্যভিত্তি দেবার গরজে নীরদচন্দ্র এও দেখান যে নিজেরও অগোচরে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গোরাদের বাড়িটাকে সদর স্ট্রিটের বাড়ি বলেই ভাবছেন, কেননা গোরা তার ছাদ থেকেই শুনতে পায় 'গির্জার ঘড়িতে এগারোটা বাজিল', অর্থাৎ গোরার বাড়ির কাছে অবশ্যই গির্জা আছে আর আমরা জানি যে গির্জা আছে সদর স্ট্রিটের বাড়িরও অল্প দূরে।

কলকাতায় আরো কোনো কোনো বাড়ির কাছে গির্জা আছে কি না, নীরদচন্দ্রের এই যুক্তিক্রমের মধ্যে কোনো শিথিলতা রইল কি না, তাঁর এই প্রত্যক্ষণ আমাদের কাছে গ্রাহ্য কি না অথবা সাহিত্যপাঠে এসব ভাবনার কোনো দরকার আছে কি না, সেটা এই মুহূর্তে আমাদের বিবেচ্য নয়। আমরা কেবল বলতে চাই, এই হলো সেই বিশী-কথিত ডিটেকটিভগিরি, অন্দরমহলের খোঁজ, সেই খোঁজের বিশেষ একটা ধরণ, আর সেই খোঁজ দিয়ে সাহিত্য বিষয়ে ভাববার বিশেষ একটা পদ্ধতি।

ঠিক এই খোঁজের দিকে এগোতে চাননি প্রমথনাথ বিশী। সাহিত্যালোচনায় যেসব তথ্যের কাছে তিনি ঋণ স্বীকার করছিলেন, তা প্রধানত বহির্মহলের জীবন থেকে পাওয়া, বহির্মহলের এবং

মনোজগতের, অন্দরের নয়। তাই সবচেয়ে বেশি তাঁর কাজে লাগে 'ছিন্নপত্র'-র চিঠিগুলি, কিংবা আর যেসব চিঠিপত্র ছাপা হয়েছে তাঁর সমালোচনার সমকালে। আর সেই সমকালে, সবারই নিশ্চয় মনে পড়বে, সেইসব চিঠিপত্রই ছাপা হয়েছে বেশি যেখানে এই অন্দরচেহারাটা সর্বাত্মকভাবে দেখা দেয়নি, সম্পাদনায় আর মুদ্রণে এ-ব্যাপারে একটা সতর্কতাকেই আমরা লক্ষ করেছি এতদিন। প্রমথনাথ তাই জীবনতথ্যের ব্যবহার করেন ঠিকই। কিন্তু সে তথ্যের অনেকখানি যেন রবীন্দ্রনাথেরই সূত্রে পাওয়া, তাঁরই লেখা স্মৃতিকথায় চিঠিপত্রে সমালোচকের প্রধান ভর, তাই রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বুঝবার একটা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে আমাদের। কিন্তু যদি একে অতিক্রম করে চলে যেতে চান কেউ? রবীন্দ্রনাথ যতদূর বলেছেন সেইখানে থেমে না থেকে, আরো একটু কৌতূহল যদি হয় কারো? তবেই কি বুদ্ধদেব বলবেন বিপদের সম্ভাবনা, দেখা দেবে 'সমালোচনায় যা অবৈধ, বা অবান্তর'?

তিরিশ বছর আগে যে সতর্কবাণীর উচ্চারণ করতে চেয়েছিলেন প্রমথনাথ, তার একটা ঐতিহাসিক কারণ হয়তো আছে। সেই 'কারণ'এর প্রসঙ্গে একটু পরে পৌঁছব আমরা। তার আগে লক্ষ করা যাক, 'রবীন্দ্রসরণী'র প্রকাশের বছরেই ছাপা হয়েছিল আরো একটি গুরুত্বময় বই, কৃষ্ণ কৃপালানির রবীন্দ্রজীবনী। ইংরেজিতে লেখা এই জীবনী-বইতে স্বতন্ত্র কোনো কাব্য বা নাটক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই, জীবনটাকেই স্পষ্ট করবার জন্য প্রধান রচনাগুলি বিষয়ে দু'তিনটে অনুচ্ছেদ তবু লিখতে হয়েছে তাঁকে। কোনো নাটক বা উপন্যাসের প্রসঙ্গে পৌঁছলে বলতে হয়েছে তার কাহিনীসূত্রটিকে, তার বক্তব্যটা, আর লেখকজীবনে রচনাটির তাৎপর্য নিয়ে সামান্য দু'চার কথা। কিন্তু 'রক্তকরবী'র কথা বলতে গিয়ে তুলনায় একটু বেশি জায়গা নেন কৃপালানি। কাহিনী বলবার জন্য নয়, তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য নয়, সে-জায়গাটা লাগে সমকালীন একটা জীবনেতিহাস জানাবার জন্য। এ-জীবনটা লেখকের সামাজিক জীবন নয়, একেবার তাঁর ব্যক্তিগত দিনযাপন। এই রচনার প্রায় সমকালে রবীন্দ্রনাথ যে কবুল করছিলেন, 'কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম', বলছিলেন, 'সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে, এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না' কিংবা 'তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম': প্রকাশিত এই কথাগুলিকে দরকার হয়নি কৃপালানির। দরকার হয়নি এই তথ্যেরও যে প্রভাতকুমারকে বলেছিলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বোম্বাইয়ের শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রত্যক্ষ বিবরণ কীভাবে তাঁর কাছে শুনছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নাটকটি লিখবার ঠিক আগেই, শিলঙে। কিন্তু সবিস্তারে তাঁর দরকার হয়েছে লেনার্ড কে. এল্‌ম্‌হার্স্টের কাছে শোনা একটা স্মৃতিবিবরণ। নাট্যরচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন এল্‌ম্‌হার্স্ট, বইটি শেষ করবার পর সেটা তিনি উৎসর্গও করেছেন তাঁকে, তাই এই বিবরণের একটা যুক্তি নিশ্চয় আছে। কিন্তু কী আছে সেই স্মৃতিতে? আছে এই কথা যে জোড়াসাঁকোয় গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথেরা না কি তাঁদের ঘরোয়া আড্ডায় জিজ্ঞেস করতেন এল্‌ম্‌হার্স্টকে: ব্যাপারটা কী? হলো কী রবীন্দ্রনাথের? (এইভাবেই বলেছেন এল্‌ম্‌হার্স্ট, এইভাবেই লিখেছেন কৃপালানি) 'Whence this outpouring of new poems of a fine and noble vintage? Whence this new inspiration? Is there a cause? Of course there must be. We guessed it ...' কী তাঁরা অনুমান করেছেন, সে-বিষয়েও খুব একটা অস্পষ্টতা রাখেননি এল্‌ম্‌হার্স্ট বা কৃপালানি, কেননা একটু আগে এল্‌ম্‌হার্স্টের জবানিতে পাই যে নাটকের চরিত্রসম্পর্কগুলির মধ্যে এই একটা সুবাস্তব ভিত্তি আছে, আছে 'the human relationship between himself, myself and W.', এটাই ছিল 'the embryonic idea on which his imagination had set to work'। অর্থাৎ, 'রক্তকরবী' নাটকে রাজা-রঞ্জন-নন্দিনীর যে প্রণয়সংঘাত দেখা যায় তার মূল খুঁজতে হবে রবীন্দ্রনাথ-এল্‌ম্‌হার্স্ট আর W.-চিহ্নিত কোনো মহিলার ত্রিভুজ-সম্পর্কের মধ্যে। এই W. বা Womanটি কে, এ নিয়ে চকিত একটা কৌতূহল জেগে-ওঠা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু তার আগে লক্ষ করবার যোগ্য আরো একটা বিষয় আছে।

কৃপালানির বইটির পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে ১৯৮০ সালে। আঠারো বছর পর বইটি আবার যখন ছাপছেন এর লেখক, তখন এর খুবই যে বিশদ বদল হয়েছে এমন বলা যাবে না; কিন্তু বেশ লক্ষণীয় রকমের বড়োমাপের সংযোজন দেখি 'রক্তকরবী'র অংশে। প্রথমে যে নাটক বিষয়ে কৃপালানি কথা শেষ করেছিলেন ৭০ লাইনের মধ্যে, দ্বিতীয় সংস্করণে তার পরিমাণ হল ১৫০-এরও বেশি। এতটা নতুন কথা কী এল এখানে? আর কিছু নয়, এল্‌ম্‌হার্স্টের সেই স্মৃতিচিন্তারই আরো অনেক প্রসারণ। এখানে আমরা এবার ব্যক্তভাবেই জানতে পাই, কীভাবে এল্‌ম্‌হার্স্টকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর ব্যক্তিজীবনের শূন্যতার কথা। অল্প বয়স থেকে নতুনবৌঠানের সখ্য ছিল তাঁর কাছে 'creative and memorable', তাঁর মৃত্যুর পর, স্ত্রীর মৃত্যুর পর, দীর্ঘকাল উদ্দীপক কোনো নারীর সান্নিধ্যে আসেননি তিনি, 'until ... the day that an old friend arrived to stay at Santiniketan bringing with him his teenage daughter'। এই মেয়েটি, এল্‌ম্‌হার্স্টের স্মৃতি-অনুযায়ী, 'vividly brought back to Tagore the memory of his boyhood

companion'। 'রক্তকরবী' রচনার কাল এবং এই 'teenage daughter'-এর সান্নিধ্য, এ-দু'টি তথ্যের সংযোগে এবার অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে আসে আমাদের কাছে: মহিলাটি কে। কিন্তু ওইটুকুতেই থেমে যান না এল্‌ম্‌হার্স্ট বা কৃপালানি। কবিজীবনের নতুন এই সম্পর্ক, তাকে নিয়ে স্বজন প্রতিবেশীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠার ধরণ, এসবের পুরো একটা বিবরণই আমরা পেয়ে যাই জীবনীতে। এমনকী এই কথাও যে রবীন্দ্রনাথ নাকি বলছেন, 'for goodness sake, Gagen (Sic) don't breathe a word of this to your wife or the news will be round Calcutta like wild fire. They are all abusing me at Santiniketan as it is'।

কৃপালানির বইটি সমালোচনার বই নয়, জীবনী। তাই নাট্যপ্রসঙ্গে জীবনকথার এই ব্যাপ্তি হয়তো প্রত্যাশিতও লাগতে পারে কারো কাছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সংযোজিত এই ৮০ লাইন তিনি প্রথম সংস্করণেই ছাপতে চাননি কেন? তথ্যগুলি কি তিনি নতুন করে পেলেন মধ্যবর্তী সময়টায়? এল্‌ম্‌হার্স্ট কি পরে আরো বিশদ করে জানিয়েছিলেন এই 'খবরগুলি'? সেটা যে নয় তা বোঝা যায় প্রথম সংস্করণের ঠিক-ঠিক জায়গায় লিডারচিহ্ন বা বর্জনচিহ্নগুলির দিকে চোখ রাখলে। ওই চিহ্নগুলি বুঝিয়ে দেয়, সংগৃহীত তথ্যাবলিকে তিনি প্রথমে অনেকটা রয়েসয়ে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, অনেকটা বর্জন করে।

প্রায় কুড়ি বছর আগে যাকে বর্জনীয় মনে হয়েছিল তাঁর, কুড়ি বছর পরে সেটা তুলে আনলেন কেন আবার? অন্দরমহলকে এইভাবে ক্রমপ্রকাশ্য করে তোলায় কৃপালানির মানসিক অনুমোদন, আর অন্দরমহলগত কৌতূহল থেকে মনকে সরিয়ে আনবার প্রমথনাথীয় নির্দেশ, দু'য়েরই মূলে আছে, মনে হয়, একই ইতিহাস। একই ঘটনার দু'রকম প্রতিক্রিয়ায় এ-দুই বিপরীত মানসিকতার উদ্ভব।

৩

রবীন্দ্রনাথের একটি 'গুরুদেব' মূর্তি আমাদের সামনে তৈরি হয়ে ছিল অনেকদিন। দীর্ঘকাল জুড়ে অনেক প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে তাঁর, কিন্তু নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই চোখের সামনে ভেসে ওঠে শুধু শাদা চুল শাদা দাড়ির এক দেবোপম মুখ, পশ্চিমে অনেকেই যার তুলনা দেবার জন্য চলে যান খ্রিষ্টমুখ পর্যন্ত। যে-বাঙালি চিকিৎসকটি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অবহিত করেছিলেন ইয়েট্‌সকে, তাঁকেও বলতে হয়েছিল, 'He is the first among our saints who has not refused to live'। এই বাঙালি, রবীন্দ্রনাথের বেশ কাছের মানুষ হয়েও, তাঁর প্রেমের কবিতাগুলির বর্ণনা দিতে গিয়েও, ভুলতে পারেননি যে তিনি 'saint'। যে অজিতকুমার চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্রসাহিত্যে আমাদের প্রথম পাঠ, তাঁর বইয়ের নাম 'কাব্যপরিক্রমা'। আপাতনিরীহ এই নামটির পিছনে কোন্ মন যে ক্রিয়াশীল ছিল তা আমরা টের পাই এ-নামের ইতিহাস থেকে। কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক করে দিয়েছিলেন এই নাম, একথা বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অজিতকুমার লেখেন: 'কাশীপরিক্রমা, ব্রজপরিক্রমা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের নাম আছে। আমরা যে রবীন্দ্রকাব্যতীর্থ পরিক্রমণ করিতেছি তাহার এই সামান্য বৃত্তান্তের নাম কাব্যপরিক্রমা রাখিয়া আমার বন্ধু আমার তীর্থ পরিক্রমণ সার্থক করিয়াছেন।'

গুরুদেব, saint, তীর্থ: এইসব শব্দের আবেগ থেকে আলোচনা শুরু হয় বলে, সাহিত্যকে অনেকসময়ে আমাদের জীবন থেকে সরানো দূরবর্তী একটা কাণ্ড বলে মনে হতে থাকে। ভয়মেশানো একটা সমীহা তৈরি হতে থাকে রচয়িতাকে নিয়ে, তাঁর রচনাকে নিয়ে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবিরশ্মি'র প্রায় সূচনাতেই আমাদের বলে দেন যে, রবীন্দ্রনাথ সেইরকম এক 'উচ্চতম কবি', 'যাঁহার কাব্য অতিমাত্র ব্যাপক, যাহা নিজে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। যাহার শিক্ষা — নাল্পে সুখমস্তি যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্।' সুসংস্কৃত এই শব্দপুঞ্জের পরেই শুরু হয়ে যায় ভাষার আরেকরকম ধরতাই, আমরা জানতে পাই কবিতা হলো সেই জিনিস যা 'সামান্যতা পরিহার করিয়া ভূমানন্দের অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে প্রকাশিত' হয়ে উঠছে। একজন ভালোবেসেছেন, তাঁর মন খারাপ লাগছে, কোনো-একটা অলক্ষ্য আবেগে কেবলই চঞ্চল হয়ে উঠছে মন, কী যে চান কী-বা চান না সবসময়ে ধরতে পারেন না সেটা — এইরকম এক অনিশ্চয়ের ব্যাকুল মনকে বোঝাবার জন্য যে-মুহূর্তে কেউ এই সহজ অভিজ্ঞতাগুলিকে সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'অন্তর্গূঢ় প্রতিভার বিকাশবেদনা তাঁহাকে আকুল করিয়াছে', তখন সন্দেহ হয়, সাহিত্য ব্যাপারটা ঠিক আমাদের পাঁচজনের জন্য নয়, মাত্র 'অন্তর্গূঢ় প্রতিভা'-সম্পন্ন কারো কারো বিষয় ওটা। 'ছুটে আয় তবে ছুটে আয় সবে/ অতি দূর দূর যাব' বললে এর ছবি আর আবেগ তো বেশ সহজেই ছোঁয়া যায়, কিন্তু এরই জন্য যদি শুনতে হয় যে 'কবি কিশোর বয়সেই গতির মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য "পথিক" বেশে যাত্রা করিয়াছেন' তখন সঙ্গে সঙ্গে খুব সাজানো মনে হয় শিল্পকাজের জগৎটাকে, পাঠকের দিনযাপনের কোনো অংশ আর হয়ে উঠতে পারে না সেটা। রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে সাধারণের 'ঘনিষ্ঠ পরিচয়' গড়ে তোলা দরকার, একথা যখন বলেন মোহিতলাল, তখনও কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তিনি দেখেন 'সর্ব্বাশ্রয়ী রসকুতূহলী কল্পনা'র দিব্যতায়, লেখেন যে তাঁর লেখা 'সর্ব্ববস্তুতে আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী বিরাট সত্তার যে রসরূপ আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এমন ভিন্নমুখী হইয়াছে।' রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠ তাই মোহিতলালের কাছে যেন

চন্দ্রলোক থেকে পৃথিবীকে দেখবার পাঠ।

লেখককে আর তাঁর রচনাকে এইভাবে পাঠকের চেয়ে অনেক দূরের সামগ্রী হিসেবে সাজিয়ে দেখা হয়েছিল বলে, আলোচনার মধ্যে প্রতিদিনের কোনো সংস্রব ছিল না বলে, প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল এর বিরুদ্ধে একটা ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া। শিল্প বিষয়ে ভাববার একটা পদ্ধতি আছে যেখানে এই দৈনন্দিনের ছোঁয়াকে মনে করা হয় আবিল, পরিহার্য। রবীন্দ্রবিচারে যে কতটাই তা মনে হতো, 'স্মরণ' বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যে তা বোঝা যায়। একচল্লিশ বছর বয়সে উনচল্লিশ বছরের স্ত্রীকে হারাবার পর যে কবিতাগুচ্ছ লিখেছিলেন কবি, তার বিষয়ে বলছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : '....আশ্চর্যের বিষয় যে এক পত্নীবিয়োগশোক ছাড়া আর **কোন ঘটনাই** তাঁহার **কাব্য-আত্মায়** কোন **কলঙ্কমলিন** স্পর্শ সঞ্চার করে নাই। আর পত্নীশোকও তাঁহার চিত্তনির্লিপ্ততার প্রসাদে **উচ্চতর ভাবলোকে উদ্বর্তিত** হইয়া সমস্ত **আবিলতার** চিহ্নমুক্ত হইয়াছে।' ঘটনার স্পর্শ তাহলে 'কলঙ্কমলিন' আর 'আবিল'— লক্ষ করুন এই শব্দদু'টো — আর অন্যদিকে ভাবুন 'কাব্য-আত্মা' বা 'উচ্চতর ভাবলোকে উদ্বর্তিত' হবার মতো প্রয়োগগুলি।

এই উচ্চতর ভাবলোকের বিশদ বর্ণনা দেবার পরেও অজিতকুমার কিন্তু কাছের-থেকে-দেখা-এই-মানুষটির জীবন-প্রসঙ্গও ছুঁয়ে গিয়েছিলেন কখনো কখনো। 'ডাকঘর'-এর কথা বলতে বলতে একবার যেমন সন্তর্পণে মনে করিয়ে দেন : '"জীবনস্মৃতি" এবং "ডাকঘর" প্রায় একই সময়ে বাহির হইয়াছে, সুতরাং এ দু'য়ের মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করিতে পারি না কি? সেই ফিরিওয়ালার ডাক, রাত্রে ঘণ্টার শব্দ, সেই কল্পনা ভারাক্রান্ত মন — এ তো কোনো মতেই আমাদের কাছে অপরিচিত নয়।' এই পর্যন্তই অবশ্য, এ নিয়ে আর বেশি দূরে এগোতে চান না তিনি। 'ছিন্নপত্র'-র চিঠিগুলিকে যে খণ্ডিত করা হয়েছে, সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তার ব্যক্তিগত অংশগুলি, সে-বিষয়ে অল্প একটু অনুযোগ জানান তিনি : 'ছিন্ন হইবার বেদনার রক্তলেখা ইহাদের গায়ে লাগিয়া আছে', কিন্তু ঠিক তারপরেই কথাটাকে সরিয়ে নিয়ে বলেন : 'কিন্তু না, আমি বোধহয় ভুল করিতেছি। এ চিঠিগুলি ঠিক ছিন্নদলের মতো নয়, কারণ ইহাদের মধ্যে একটি ভাবসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি।'

এই অজিতকুমারেরই 'জীবনস্মৃতি' প্রবন্ধটিকে বলা যায় উত্তরকালীন প্রমথনাথ বিশীর ভিত্তি। 'জীবনস্মৃতি' পড়তে পড়তে যে অজিতকুমারের মনে হয়েছিল এরই সঙ্গে মিলিয়ে পড়া উচিত 'শিশু' কাব্যটি, কিংবা 'বউঠাকুরানীর হাট'-এর বসন্ত রায় বা 'রাজা'র ঠাকুর্দার বীজ যে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন 'জীবনস্মৃতি'রই চরিত্রশালায়, সেইখান থেকে শুরু করেন প্রমথনাথ। অতিদূর ভূমাস্পর্শ থেকে অল্প একটু নেমে আসবার সুযোগ হলো এই আলোচনায়।

কিন্তু আগেই বলেছি, কাব্যবিচারে প্রমথনাথ যে জীবনতথ্যের কথা ভাবেন, সে হলো এক বহির্মহল। প্রমথনাথের আলোচনা যখন পরিণামের দিকে পৌঁছেছে প্রায়, রবীন্দ্র- সমালোচনার আরো একটা বড়ো পর্বের যখন অবসান হয়ে আসছে, ঠিক সেই সময়েই দেখা দিল প্রায়-ইতিহাস-তৈরি-করা একখানি বই : জগদীশ ভট্টাচার্যের 'কবিমানসী'। ১৯৬২ সালে, একেবারে একই বছরে, ছাপা হয়ে বেরোল কৃপালানির রবীন্দ্রজীবনী, প্রমথনাথের 'রবীন্দ্রসরণী' আর এই 'কবিমানসী'। বই হিসেবে প্রকাশিত হবার আগে কয়েকবছর ধরে জগদীশ ভট্টাচার্যের এই লেখা ছাপা হচ্ছিল 'শনিবারের চিঠি'র পাতায়, চঞ্চল হয়ে উঠেছিল পাঠকসমাজ। যেন অনেকদিনের একটা taboo ভেঙে দিচ্ছে এই লেখা ; দেখেও যা দেখতে নেই, জেনেও যা জানতে নেই এমন এক অদৃশ্য নিষেধকে যেন টপকে যাচ্ছে এই লেখা। রক্তে-মাংসে সজীব এক নারীর প্রেরণাই — না, বরং বলা যাক এক মহিলার প্রেরণাই যে ক্রিয়াশীল ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনার গভীরে, সবিস্তারে তা প্রতিপন্ন করলেন জগদীশ ভট্টাচার্য। তরুণ বুদ্ধদেব বসু একদিন রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার মধ্যে দেখেছিলেন 'অতিরিক্ত-রকম আধ্যাত্মিক' চেহারা, তাকে মনে হয়েছিল 'সুন্দর, অত্যন্ত সুন্দর কাব্য, কিন্তু একবারে impersonal। কবির নিজের অর্থাৎ মানুষটির হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ এসব কবিতায়' তিনি পান না। আর 'কবিমানসী' বইটি খোঁজ দিচ্ছে সেই স্পর্শের, একজন মানুষের হৃদয়ের, আর এইভাবে যেন পৌঁছলাম জীবনকথার এক নতুন অন্দরে।

পৌঁছবার এই আগ্রহ, আগ্রহের অতিশয্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো কাউকে কাউকে দিয়ে এতদূরও বলিয়ে নিচ্ছিল সেদিন যে রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর নতুন বৌঠান না কি 'fell desperately in love with each other ... had got worse and worse until his sister-in-law killed herself'। রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষেই প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ, বা জগদীশ ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণকে খানিকটা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করবার অসাহিত্যিক জল্পনা, অনেককে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল সেদিন। বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রমথনাথ বিশীরও তাই মনে হতে শুরু করেছিল, কবিতার বিচারে এতদূর ব্যক্তিগতের এতদূর নেপথ্যের উদ্ঘাটন 'অবৈধ' বা 'অবান্তর', কবিতাস্বাদের বদলে এর মধ্যে পাওয়া যায় শুধু কৌতূহলের তৃপ্তি, এই হলো নিষ্ফল এক ডিটেকটিভগিরি। আর অন্যদিকে, জীবনীই যিনি লিখতে চান, অনেকখানি লিখেও তিনি থমকে যান খানিকটা, ভুল বুঝবার বা ভুল বোঝাবার আবহাওয়ায় সবটুকু কথা বলে ফেলতে দ্বিধাবোধ করেন ; তারপর যখন বেশ

কিছুদিনের ব্যবহারে, আলোচনা আর প্রত্যালোচনায়, কথাগুলি স্বচ্ছন্দ হয়ে আসে অনেকটা, অনেকের কাছে, তখন, প্রায় কুড়ি বছর পর, ভাবেন যে সম্পূর্ণ করে তথ্য বলতে ইতস্তত করবার কোনো কারণ নেই আর।

৪

কিন্তু কাকে বলে সম্পূর্ণ তথ্য? কীভাবে কতদিনে জানা যায় তা? 'তবু কি আমার কথা বুঝেছিলে, বেনেবউ পাখি?' একটি কবিতা আছে অলোকরঞ্জনের : 'আমাকে বুঝতে পারা এতই সহজ?/ কারুকেই বোঝা যায় না কি!' আর 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' পড়ে প্রমথনাথকে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, '... শেষকালে আমাকে নিয়ে পড়েছিস। বিষয় হিসাবে আমি কি নিতান্ত সহজ।'

এল্‌ম্‌হার্স্টের বলা বৃত্তান্তের পর আজ আমাদের সামনে অল্পে অল্পে এসে পৌঁছচ্ছে শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের নিজেরই অনেক স্মৃতির টুকরো। 'বেঁচে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি' — লিখছেন আজ শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। লিখছেন, 'এ দুঃখ যাবার নয়। বিশেষ করে যখন আমার জন্য লেখা গানগুলো মনে পড়ে।' 'কোরক' বা 'The Statesman' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিতে দেখি সে গানগুলি হলো, 'অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে', 'ওই মরণের সাগরপারে চুপে চুপে', 'এবার উজাড় করে লও হে আমার যা-কিছু সম্বল' আর 'না বলে যায় পাছে সে'। এ-তালিকায় অবশ্য আরো আছে 'তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার' গানটিও, তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পরেই নাকি কলকাতায় বসে গানটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কথাটায় ঈষৎ অসংগতি হয়তো আছে, কেননা ভিন্ন তথ্যসূত্রে এ তো দেখাই যায় যে গানের মূল কাব্যরূপটি লিখেছিলেন তিনি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরবার পথে জুলিয়ো চেজারে জাহাজে। অসম্ভব নয় যে ফিরবার পর কলকাতাতেই তার গীতিরূপ তৈরি হলো, আর একসময়ে সেটা তিনি তুলে দিলেন রাণুর হাতে, তাঁর বিয়ে ঠিক হবার পর।

ঠিক সেইরকমই, এই গানগুলির মতোই, 'রক্তকরবী' নাটকের সঙ্গেও নিজের সাযুজ্য যদি দেখেন রাণু তো অবাক হবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ যদি এতটাই বলে থাকেন যে, 'she is the figure around whom the whole theme revolves', তাহলে এ-দেখায় তো অন্যায়ও থাকে না কিছু। মৃত্যুর কিছুদিন আগে অমিয় চক্রবর্তীও তাঁর এক স্নেহভাজনকে চিঠিতে লিখেছেন যে, 'রক্তকরবীর নায়িকা — আমার মনে হয় শ্রীমতী রাণু অধিকারী (এখন লেডী মুখার্জী) দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি ঐ সময়ে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন কাশী থেকে — তাঁর একটি স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এবং চারিত্রিক মাধুর্য কবিকে আনন্দিত করে।'

এইসব খবর, আর রবীন্দ্রভবনে সঞ্চিত এ-দু'টি মানুষের চিঠিপত্রের দেওয়ানেওয়া থেকে কবিজীবনের এক নূতন অন্দর প্রকাশ্য হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'ও 'ছিন্নপত্র'র মতোই খণ্ডিত করে শিল্পিত করে নেওয়া, ছিন্ন হবার রক্তের দাগ আছে এখানেও। ছিন্নকে পূর্ণ করে নেওয়া হয় যদি — হবেই, অচিরে — তবে আমরা দেখতে পাব ওই 'teenage daughter'-কে লেখা তাঁর এইসব কথার টুকরো :

১. আমি আমার জীবনকে তাঁরই কাজে উৎসর্গ করেছি — সেই উৎসর্গকে তিনি যে গ্রহণ করেছেন তাই মাঝে মাঝে তিনি আমাকে নানা ইসারায় জানিয়ে দেন — হঠাৎ তুমি তাঁরই দূত হয়ে আমার কাছে এসেছ, তোমার উপরে আমার গভীর স্নেহ তাঁর সেই ইসারা। এই আমার পুরস্কার। এতে আমার কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ হয়, আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, আমার মনের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

২. আমি বড় আশা করে আছি যে, আমার মধ্যে যা কিছু ভালো এবং সত্য তাই দিয়ে আমি তোমার জীবনকে উন্নত উজ্জ্বল সুন্দর পবিত্র এবং সেবাপরায়ণ করে তুলব। যদি তোমার জীবনে কিছুমাত্র ভার, বা দুঃখ, বা ক্ষুদ্রতা বা ব্যর্থতা আনি তাহলে আমার অনুতাপের সীমা থাকবে না।

৩. রাণু, তুমি যদি আমাকে যথার্থ ভালবাস তাহলে আমার ভাল কাজে তোমার আনন্দ যেন হয়, আমি সকলকেই ভালবাসি এতেই যেন তোমার মন প্রসন্ন হয়, যারা আমার কাছে আসবে তারা আমার কাছে থেকে যেন প্রীতির দান ও পূজার নির্ম্মাল্য নিয়ে যেতে পারে এই তোমার যেন কামনা হয়। আমাকে ছোট করে দেখো না, ছোট করতে চেয়ো না — তাহলেই আমার সঙ্গ পেয়ে আমার স্নেহে আমার আশীর্বাদে তুমিও বড় হয়ে উঠবে, তোমার মন তাহলে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হবে।

এমন উচ্চারণের সঙ্গে যদি জুড়ে দিই লেডি মুখার্জির কন্যাকে লেখা এল্‌ম্‌হার্স্টের এইসব পত্রাংশ : 'Tagore had decided in fairness to Ma and to her coming marriage that he must cut completely all affectionate correspondence and personal meetings with Ma. Ma felt deserted. Gurudev too felt the break'। কিংবা 'Gurudev told me of how deeply he was reminded, when he met Ma and had her first to stay with him, of his late sister-in-law, who until Gurudev was married was companion to Gurudev whilst her husband at work'। আর শেষ পর্যন্ত 'Gurudev and your mother and I were locked in a triangular entanglement that brought a deeply rich experience

and treasured memories for all three of us'।

তাহলে, এসব শুনবার পর, রবীন্দ্রনাথের জীবনকথার এক অল্পগোচর অধ্যায় যে অনেকটা আলো পেয়ে যায় তা মানতে হবে। আর তখন, ১৯১৮ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলিকে কোনো নতুন চোখে দেখতে চাইলে অবাক হবার কিছু নেই। হয়তো তখন, কিশোরী রাণু যে তাঁকে কাদম্বরীদেবীর কথা মনে করিয়ে দেন জেনে, 'এই বুঝি মোর ভোরের তারা এল সাঁঝের তারার বেশে', ১৯১৯ সালে লেখা এই গানের নিশ্চয় নতুন একটা অভিপ্রায় খুঁজে পাওয়া যায়; সুরে যখন শুনি 'সকালবেলা আমার হৃদয় ভরিয়েছিল পথের গানে/ সন্ধ্যাবেলা বাজায় বীণা কোন্ সুরে যে কেই বা জানে' কিংবা শেষ পর্যন্ত 'বারে বারে নতুন করে চিত্ত আমার ভুলাবে সে', তখন জীবনতথ্যের সহযোগে লেখকের একটা অভিপ্রায় নিশ্চয় এর মধ্য থেকে দেখা দিতে থাকে। 'তুমি তাঁরই দূত হয়ে আমার কাছে এসেছ': চিঠিতে এই কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে 'পূরবী'র 'আহ্বান' কবিতা — অথবা অন্য কয়েকটি — যেন একটা নতুন মানে পেয়ে যায় তখন; সেই 'তুমি'কে যেন অনেকটা কাছের থেকেই দেখতে পাই আমরা, যে 'তুমি'

'...আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোকে, হে কল্যাণী
দেবতার দূতী।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছ তব বাণী
স্বর্গের আকুতি।'

ভিতরকার কবিকে যে ডাক দিতে পারে, তেমনই কাউকে তিনি ডেকে ফিরেছেন বারে বারে, 'সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার/ থাকিয়া থাকিয়া।' কে সে নারী? প্রমথনাথ বিশীর কাছে সে এক 'মিশ্র নারীসত্তা', 'রূপান্তরিত নারী' বা 'আদর্শ নারী'; 'বাস্তবের ক্ষেত্রে ইহারা বিচিত্র বা বহু বা women, কল্পনার ক্ষেত্রে ইহারা এক বা the woman!' সেই বাস্তবেরই women-দের খুঁজে দেখবার দরকার হয়নি প্রমথনাথের, জগদীশ ভট্টাচার্য সেখানে দেখতে চেয়েছেন বিশিষ্ট কোনো নারীকে, আর এইসব চিঠিপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে হয়তো আরো একজন নারীর সম্পর্কইতিহাসও যুক্ত হয়ে থাকে এই কবিতায়, 'পূরবী'র আরো অনেক কবিতায়। জুলিয়া চেজারে জাহাজে যখন তিনি ভেসে আসছিলেন আর্জেন্টিনা থেকে, 'তার হাতে ছিল' গানটি যখন লিখছিলেন তিনি, তখন কি নামত কারো কথা ভাবছিলেন রবীন্দ্রনাথ? ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে দু'মাসের সখ্যসম্পর্ক কাটিয়ে ফিরে আসছিলেন বলে কারো হয়তো ওই প্রসঙ্গে মনে হতে পারে ভিক্টোরিয়ার নাম, নিশ্চিতই যেমন মনে হয়েছে শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসনের, আবার নতুন তথ্যের সংযোগে এবারে হয়তো কারো মনে পড়বে ভিন্ন কাউকে, যিনি বলছেন এ-গান তাঁকে নিয়েই লেখা। আরেকটা সত্য জানা হবে আমাদের। আরেকটা অভিপ্রায়।

৫

কিন্তু সেটাই কি সত্য জানা হবে? ওই গান ওই কবিতা ওই নাটকের বিচারে সত্যিই কি জানবার দরকার আছে সাধারণ্যে অগোচর এইসব তথ্য? এতক্ষণ, আমরা কি লক্ষ করিনি, রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা-নাটক নিয়ে যে কথাবার্তা, তা একেবারে গড়িয়ে গেছে শুধু রবীন্দ্রনাথেরই দিকে? 'তাই তো হবার কথা' কেউ কেউ বলবেন। কিন্তু তা-ই কি হবার কথা? রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে, রবীন্দ্রনাথের গান শুনে, রবীন্দ্রনাথের নাটক দেখে আমরা কি রবীন্দ্রনাথকেই চাই, তাঁকেই জানতে চাই আরো বেশি বেশি করে? না কি জানতে চাই সেই কথাটুকু, সেই বেদনাগুলি, যা তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, কী তিনি বলতে চেয়েছিলেন। তাঁকে না জানলে, তাঁর অভিপ্রায় না জানলে, তাঁর লেখার তাৎপর্য, সে লেখার 'মানে'— সেটা কীভাবেই বা ঠিকমতো পৌঁছবে আমাদের কাছে?

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তরুণ বুদ্ধদেব যে একদিন ভেবেছিলেন তার মধ্যে আছে এক আদর্শবাদ, এক ধরণের আধ্যাত্মিকতা, সেটা কি ঠিক ভেবেছিলেন তিনি? সেসব লেখাকে যে একেবারে impersonal বলে মনে হয়েছিল তাঁর, সেটা কি তাঁর ঠিক মনে-হওয়া?

নয় নিশ্চয়। জীবনতথ্য জানবার পর কেউ বলতে পারেন তা। যে মুহূর্তে সেই তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি এই লেখা, তখন বুঝতে পারি যে কবির 'অভিপ্রায়' আমরা ঠিক ধরতে পারিনি আগে, হয়তো বেশ personal ভাবেই লিখতে চেয়েছিলেন তিনি, সেটাই ছিল তাঁর উপাদান। কিন্তু যে কবিতায় 'হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ' পাওয়া যাচ্ছিল না আগে, এই তথ্য জানবার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে কি উষ্ণ হয়ে উঠবে সেটা? অন্যপক্ষে এটাও লক্ষণীয় যে 'ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি/ হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি' জাতীয় কবিতায় ব্যক্তিগত আবেগ খুঁজে না পেলেও, বুদ্ধদেব কিন্তু তাঁর প্রত্যাশিত তাপ, passion, ঠিকই পেয়ে গেছেন 'পূরবী', 'মহুয়া'র কবিতায়, লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় বা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো-বিষয়ক কোনো জীবনতথ্য জানবার অনেক আগেই। অর্থাৎ কবিতার যোগ্য প্রমাণটুকু তো কবিতারই মধ্যে থেকে যায়, থেকে যায় সত্যের ছোঁয়া, যাকে বলি কবিতার সত্য, ''নৈবেদ্য'', ''বলাকা''-র গভীর দার্শনিকতার পর রবীন্দ্রনাথ যখন লিখলেন 'পূরবী', বিস্ময়ে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম'— লিখেছিলেন সেই ১৯৩১ সালের বুদ্ধদেব। 'ছন্দবেশমুক্ত এবং স্বচ্ছন্দ, তীরের মত যা সোজা বুকে এসে

লাগে' সেইরকম কবিতা এখানে পেয়েছিলেন বলে প্রথম যৌবনে এসব বই আচ্ছন্না করে রেখেছিল তাঁদের দিনরাত, প্রতিমুহূর্তে তখন তাঁরা আউড়ে যেতে পারতেন এর কবিতাগুলি, লিখেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়।

এই কবিতাগুলি লিখবার মুহূর্তে কোন্‌টা ছিল কবির অভিপ্রায়। নিজের কথাটুকু বলা, এই নিশ্চয়। কিন্তু সেকথা বলবার মুহূর্তে সমকালীন জীবনতথ্যের সঙ্গে মিশে যায় কত বহুকালীন অনুভব-অভিজ্ঞতার রেশ, মুহূর্তটিকে ছুঁয়ে থেকে পুঞ্জে পুঞ্জে ভরে আসা কত অজস্র মুহূর্তের টান, তার কি কোনো হিসেব আছে? কথাটা বলা হয়ে যাবার পর সবার সামনে যখন লেখক তুলে ধরছেন তাঁর লেখা, প্রকাশ করছেন তাকে, তখন কি একটা ব্যক্তিগত 'খবর' অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তার অভিপ্রায়, না কি সকলেরই একটা ব্যক্তিগত মুহূর্ত গড়ে তোলেন তিনি সেখানে? ঠিক সচেতন কোনো ইচ্ছে থেকে নয়, কিন্তু এই বোধ থেকে যে 'বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ, আমার সে নয় সবার সে আজ', আর তা যদি না হতো তাহলে শিল্পসাহিত্য হয়ে দাঁড়াত কেবল খবর বিনিময়ের জায়গা। 'সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে/ আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না' কিংবা 'কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে' কিংবা 'তোমায় আমি রেখে এলেম ঈশ্বরের হাতে': আবেশভরা এইসব কবিতার লাইন থেকে যদি প্রথমেই আমাদের কৌতূহল হয় যে কোন্ মেয়েটির কথা এখানে ভাবছিলেন সুধীন্দ্রনাথ বা অমিয় চক্রবর্তী বা বুদ্ধদেব, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে লেখাগুলিকে পাঠকের কাছ থেকে আড়াল করে দেন লেখকেরা, কিংবা তাঁদের ব্যক্তিনায়িকারা। 'বলেছিনু ''ভুলিব না'' যবে তব ছলছল আঁখি/ নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা করো যদি ভুলে থাকি': কার ছলছল আঁখি? সে-প্রশ্নের কোথাও কোনো মানে নেই তা বলি না, কিন্তু যে-মুহূর্তে এ-প্রশ্নের উত্থাপন, তখনই তা আমার কাছ থেকে সরে যায় দূরে, কবিতার থেকে কবির ব্যক্তিগত মুখই তখন হয়ে উঠতে চায় বড়ো। কবির মুখও দেখতে পারি আমরা, দেখতে পাই, কিন্তু তাঁর নিছক ব্যক্তিগত মুখটুকু নয়, আমরা দেখতে চাই তাঁর সেই মুখ যেখানে এই অনুভব সকলেরই জন্য একটা প্রতিচ্ছবি রেখে যায়, তাঁর কবিমুখ। 'রক্তকরবী' লিখবার মুহূর্তে সদ্যমৃতা রাণু অধিকারীর স্নিগ্ধ ছলাছল, তাঁর সরল এবং অদম্য দিনযাপন, সুসামাজিকতার সমস্ত জাল, তার বাধা আর নিয়মতন্ত্র ভেঙে দিয়ে কবির একলা জীবনের উষরতার মধ্যে তাঁর নবীন এক সঞ্চার নিয়ে আসা: নিছক তথ্য হিসেবে এর কোনো দাম নেই তা নয়। কিন্তু সে-তথ্যকে প্রধান করে তুললে তাকে কি বলা যাবে সেই মহানাটকের অভিপ্রায়, যা আমাদের সাম্প্রতিক জীবনের বহু বিচিত্র জটিল অভিজ্ঞতাকে একইসঙ্গে ধরে রেখেছে বলে দেখতে পাই? অন্তত এল্‌মহার্স্ট যে মনে রেখেছিলেন সেকথা, তা আমরা বুঝতে পারি। তাঁদের তিনজনের সম্পর্কমহিমার কথা পুঙ্খে পুঙ্খে বর্ণনা করেও একথা বলতে তিনি ভোলেননি যে 'In the mind of a great artist, poet or painter, the imagination of an actual situation may be so married to the need to express some great idea that the work of art that emerges will have little or no relation at all to the original raw material used'। আর যখনই এটা ভুলে যাই আমরা, তখনই লেখা আর পাঠকের মাঝখানে লেখকের শুকনো উপাদানটাকেই লেখকের অভিপ্রায় বলে ভুল করতে থাকি। লেখাকেই আমরা চাই, লেখককে নয়। নিষ্টুর শোনালেও কথাটা সত্য যে সোনার ধানটুকুকেই চাই আমরা; নৌকোয় যিনি তুলে দিয়েছিলেন, তাঁকে নয়।

আমরা সকলেই আছি একটা ব্যক্তিগণ্ডির মধ্যে বাঁধা। ব্যাপক এই বিচ্ছিন্নতার দিনে সেই গণ্ডিকেই করে তুলছি সত্য থেকে সত্যতর। শিল্পসাহিত্য পারে সেই গণ্ডিটা একটু খুলে দিতে, আমাকে আমার বাইরে করে আনতে পারে সে কিছুটা। কোনো লেখা তখন হয়ে দাঁড়ায় সংসারের সঙ্গে আমার সংযোগসূত্র। সমালোচনারও দায় সেই সংযোগটাকেই দেখতে পাওয়া, দেখাতে চাওয়া! কিন্তু তার বদলে আমারও যদি আমাদের টেনে নেওয়া হয় লেখকেরই কোনো নিজস্ব ব্যক্তিগণ্ডির দিকে, আবার তবে তৈরি হয় নতুন রকমের এক আবদ্ধতা। সেই আবদ্ধতায় লেখার চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে লেখকের মূর্তি, তার image, লেখার সঙ্গে সম্পর্কহীন সেই ইমেজগত বিঞ্জাপন। সেই মূর্তিসর্বস্বতার দিকে এগোতে এগোতে, প্রচ্ছন্নভাবেই, আরেকরকম গুরুবাদ তৈরি হয়ে যায়। আমরা দেখেই আগে 'গুরুদেব'-মূর্তি ভাঙতে গিয়ে একদিন তৈরি হয়ে উঠছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনপ্রধান সমালোচনার একটা ধাঁচ। কিন্তু এখনো আমরা টের পাইনি যে সেই ছাঁচ থেকে তৈরি হয়ে উঠছে আরেকরকম অনড় মূর্তি, সবকিছুকে তাঁরই কেন্দ্রে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে সেটা হয়ে উঠছে যেন 'গুরু'-মূর্তিরই একটা রকমফের মাত্র, একটা উলটে-ধরা গুরুবাদ।

রবীন্দ্রনাথ কি শেষপর্যন্ত নাস্তিক হয়ে উঠেছিলেন ?

দেবদাস জোয়ারদার

কিছুদিন আগে কয়জন মিলে পুরোনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনার তালিকা তৈরির কাজ করছিলাম। হঠাৎ হাতে পেলাম ১৩৪০ (১৯৩৩) বঙ্গাব্দের মাসিক 'বসুমতী'র বৈশাখ-আশ্বিন খণ্ডটি। তাতে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রমাপ্রসাদ চন্দ (১৮৭৩-১৯৪২) মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়লাম 'মানবধর্ম্মের মর্ম্মকথা'। এই প্রবন্ধে ১৩৪০-এর 'প্রবাসী'র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মানবসত্তা' নামক শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত রবীন্দ্রভাষণের আলোচনা আছে। 'মানবসত্তা', 'মানুষের ধর্ম' বইটির পরিশিষ্ট। বইটির মূল তিনটি বক্তৃতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর 'কমলা' বক্তৃতা। 'মানুষের ধর্ম' ভাষণ কবি দেন ১৯৩৩-এ, তার আগে ১৯৩১-এ অক্সফোর্ডে তিনি হিবার্ট বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন The Religion of Man। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় লেখা হলেও এ দুই সম্পূর্ণ পৃথক বই।

রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁর আলোচনায় 'The Religion of Man এবং সে-সময়ে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির বক্তব্যও প্রসঙ্গক্রমে তুলেছেন। তাছাড়া 'The Religion of Man-এর দীর্ঘকাল প্রচলিত সংস্করণের পরিশিষ্টে মুদ্রিত আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন উদ্ধৃত ও আলোচিত হয়েছে। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রধর্ম ও দর্শনচিন্তার বিস্তৃত আলোচনায় তিনি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার এই প্রবন্ধটি ছাড়া আবার আষাঢ় মাসেও একই মাসিক 'বসুমতী'তে 'মানবসত্তো ভুল' নামে আরেকটি প্রবন্ধ লেখেন। এই দু'টি ছাড়া 'সাহিত্য' ও মাসিক 'বসুমতী'তে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আরও প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। সেগুলি আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রবন্ধে তাঁর মূল বক্তব্য, 'কমতের ধর্ম্মের এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের মর্ম্মগত পার্থক্য দেখা যায় না।' উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) Positivism-এর প্রবক্তা। কোঁতের Grand Etre এবং রবীন্দ্রনাথের মহামানব চন্দমহাশয়ের কাছে এক বলে মনে হয়েছে। কবির মানবিক ভূমাকে তিনি 'কাঁঠালের আমসত্ত্বের মত আজগুবি' বলেছেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপে এসিয়ার প্রেরিত আধ্যাত্মিকতার সমাচারবাহক দূত' নন, 'ভারতবর্ষে তিনি য়ুরোপের প্রেরিত য়ুরোপীয় ঐহিকতার (materiatism) সমাচারবাহক দূত'। অথচ আমরা জানি চিঠিপত্র-নবম খণ্ডের ২৩ সংখ্যক চিঠিতে হেমন্তবালাকে কবি লিখেছিলেন যে তাঁর কথা 'য়ুরোপ থেকে ধার-করা বুলি নয়'। কিন্তু চন্দ মহাশয়ের অভিযোগ, কবির ব্যাখ্যাত মানবধর্মে য়ুরোপীয় নাস্তিকতা ও বস্তুবাদেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

সংস্কৃতে আস্তিক বলতে বেদবিশ্বাসী বোঝায়, নাস্তিক বেদে অবিশ্বাসী। এই অর্থে ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস আস্তিক বা নাস্তিক বিচারের মানদণ্ড নয়। কপিলের সাংখ্য ও মীমাংসার বেদে আস্থা আছে বলেই আস্তিক। যদিও এই দুই দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। বেদকে অস্বীকার করেন বলেই চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনগণ নাস্তিক। বাংলায় ঈশ্বরে বিশ্বাসীকে আমরা আস্তিক বলি, আর ঈশ্বরে অবিশ্বাসীকে বলা হয় নাস্তিক। এই প্রচলিত অর্থেই চন্দ মহাশয় মানুষের ধর্মব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথকে নাস্তিক বলেছেন — যদিও সমকালীন ও পূর্ববর্তী রবীন্দ্রকবিতাকে তাঁর নাস্তিকতাদুষ্ট মনে হয়নি।

রমাপ্রসাদ চন্দের আলোচনা থেকে অব্যবহিত প্রবর্তনায় রবীন্দ্রধর্মবোধের এক সামগ্রিক আলোচনা একটি মাত্র প্রবন্ধের পরিমিত পরিসরে লিখতে বসে মনে হচ্ছে যে তাঁর মতো অনেকে এ-কালেও শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথকে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী ভাববেন। তাই তাঁর ধারণার পুনর্বিচার খুবই প্রাসঙ্গিক। এই সূত্রে একালের ভাবনাচিন্তার হৃদিসও নেওয়া যাবে। তবে সেকালের চন্দমহাশয়ের সঙ্গে এ-কালের অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থরচয়িতার পার্থক্য আছে। চন্দ মহাশয় যখন রবীন্দ্রনাথকে নাস্তিক বলেছিলেন, তখন অভিযোগ ও ক্ষোভ ছিল। আর এ-কালের কোনও কোনও সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী বলতে পেরে নিজেদের দল ভারি করার আনন্দে উল্লসিত হন। আমাদের বিবেচনায় এ উল্লাস ইচ্ছাপূরণের আনন্দজনিত। এ-রকম আনন্দ থেকে অনায়াসে লেখা যায় যে শুধু সত্তাজিজ্ঞাসায় নয়, ঈশ্বরজিজ্ঞাসাতেও রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা — 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতার 'মেলে নি উত্তর'। 'শেষ লেখা'র এ-কবিতা সত্তাজিজ্ঞাসারই কবিতা, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কবিতা নয়। আর

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তরে স্পষ্টই উচ্চারিত হয়েছে কেনোপনিষদের এ-সব কথা :—

> ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।
> ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥ ১/৩

[সেখানে চোখ যায় না, বাক্য যায় না, মনও যায় না। (ব্রহ্ম কি রূপ) জানি না, এই (ব্রহ্মজ্ঞান) যে-প্রকারে উপদেশ দিতে হয় — তাও আমরা জানি না।]

ইচ্ছাপূরণের যে-আনন্দের কথা বলেছি, সে-আনন্দে দোদুল চিত্তে অনায়াসে বলা যায় যে এখানেও অজ্ঞেয়বাদের সুর বেজেছে। কেন না ঋষি বলছেন যে ব্রহ্ম এখন পর্যন্ত তাঁর অজ্ঞাত। তাঁকে তিনি জানেন না এবং জানতেও পারেন না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, শুধু ব্রহ্ম জানায় কেন, যে-কোনও গভীর ভাবনারই উত্তর নিঃশেষে দেওয়া যায় না। এই নঞর্থকেরই প্রকাশ কেনোপনিষদের এই বচনে। এই নঞতার পরিচয়ই বারবার পাই রবীন্দ্রবচনাবলীতে তাঁর ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক অনুভব ও চিন্তাপ্রকাশের ক্ষেত্রে।

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় অনুভব ও চিন্তার অসাধারণ ভাষ্যকার আবু সয়ীদ আইয়ুব নিজেকে নাস্তিক বলেই পরিচয় দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও রীবন্দ্রনাথকে দলে টানার উল্লাস তাঁর আলোচনায় নেই। রবীন্দ্রপ্রাণন ও মননের বিবর্তনের রূপরেখা অঙ্কনেই তাঁর উৎসাহ। তিনি গত্যানুগতিক অর্থে যে 'নাস্তিক' নন, তা তাঁর নিজের কথায়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 'স্রষ্টা, বিধাতা এবং ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করা যদি চ আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু আমি কোনো অর্থেই জড়বাদী নই'।[১] কেন না তিনি ভুলতে পারেন না 'অনেকান্ত বিশ্বজগতের একটা অন্ত বা দিকমাত্র বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত, বাকিটা ধরাছোঁয়ার বাইরে, অপার গভীর রহস্যে ঢাকা।'[২] তাই এ-হেন নাস্তিকের পক্ষে 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতার 'মেলে নি উত্তর' কথা কয়টি ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে বলা হয়েছে — এ-রকম কথা বলার প্রয়োজন হয়নি; বরং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, 'কবিতাটিতে ব্রহ্মসংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা প্রত্যাখ্যান নেই।'[৩] তাঁর এসব কথা লেখারও প্রয়োজন হয়নি যে উপনিষদের অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্মের ভাবনায় গতির ধারণার কোনও অবকাশ নেই।[৪] কেন না সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নিষ্ঠাবান ছাত্র আবু সয়ীদ আইয়ুব জানেন যে তাঁর অধ্যাপক উপনিষদের দর্শন বিষয়ে লিখেছেন : 'তর্কে এমন কথা বলা হয় যে উপনিষদের ধারণায় প্রগতি অলীক, কেন না প্রগতি হচ্ছে পরিবর্তন ; আর এই পরিবর্তনও অলীক। কেন না সময়ের যে গণ্ডিতে পরিবর্তন ঘটে, সেই সময়ই কিনা উপনিষদে অলীক। কিন্তু এই অভিযোগের জন্য দায়ী উপনিষদ্ সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। এ কথা সত্য যে পরম সময়াতীত হলেও পরমের মধ্যে সময় আছে। পরমের এই আশ্রয়ের মধ্যেই আমরা যথার্থ ক্রমবিকাশ পাই। এই বিকাশই সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তি। কালস্থিত প্রক্রিয়াই বস্তুত জাগতিক প্রক্রিয়া। কেননা ব্যবহারিক সত্য রূপ পাচ্ছে সময়ের গণ্ডির মধ্যে ঐহিক পরিবর্তনে। আমরা যদি ব্যবহারিককে শাশ্বত বা নিঃসময়ের মহাশূন্যতায় সন্ধান করি, তাহলে তাকে পাবো না। উপনিষদ্ এটার উপরই গুরুত্ব দিচ্ছেন যে সময়বদ্ধ প্রক্রিয়া তার ভিত্তি ও তাৎপর্য পাচ্ছে পরমের মধ্যে। আর এই পরম স্বরূপতঃ কালাতীত। প্রকৃত প্রগতির জন্য পরমের ধারণা অপরিহার্য। সর্বব্যাপক পরমের ধারণা ব্যতিরেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে বিশ্বপ্রবাহ এক নিরন্তর অভিব্যক্তি, পরিবর্তনই প্রগতি এবং জগতের পরিণামই মঙ্গলের জয়'।[৫] রাধাকৃষ্ণনের অসাধারণ ইংরেজির এই অক্ষম বাংলা অনুবাদে ultimate অর্থে যেখানে যেখানে পরম লেখা হয়েছে, সেখানে সেখানে ব্রহ্ম বসিয়ে আমরা যদি পড়ে যাই, তাহলে বুঝতে পারব যে উপনিষদের ব্রহ্মভাবনা গতির প্রগতি ধারণারহিত নয়।

তার অর্থ এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের গতির ধারণা একমাত্র উপনিষদ থেকেই এসেছে। কেন না অভিব্যক্তি প্রস্থানের আধুনিক য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গেও কবি নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। 'বলাকা' কাব্যপ্রসঙ্গে আমরা অনেক সময় যেভাবে ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর (১৮৫৯-১৯৪১) এলাঁ ভাইতাল (elan vital) কথা উচ্চারণ করি, তখন আমরা ভুলে যাই যে, রবীন্দ্রনাথ আয়োঁরন ডারউইন, ওয়ালেস, স্পেন্সর, হক্‌স্‌লির রচনার নিষ্ঠাবান পাঠক। তাঁদের রচনাপাঠের কথা নানাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্ররচনা পড়ে আমরা জানতে পারি। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়রী' থেকে ওয়ালেসের Darwinism গ্রন্থপাঠের কথা জানতে পারছি। তখন তাঁর ঊনত্রিশ বছর বয়স। তারও দশ বছর আগে বিলেতে থাকার সময় তিনি স্পেন্সরের Data of Ethics পড়ার কথা 'জীবনস্মৃতি'তে জানিয়েছেন। একুশ-বাইশ বছর বয়সে লেখা তাঁর 'বিবিধপ্রসঙ্গ' বইটির অন্তর্ভুক্ত 'জগৎপীড়া' প্রবন্ধে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের (Evolution Theory) উল্লেখ দেখছি। হক্‌স্‌লির Evolution & Ethics বইটির আলোচনা তিনি 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় বত্রিশ বছর বয়সে করেছিলেন। তাঁর লেখাপড়ার বহুবিবিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে শুধু বলাকা-পূর্বকালেই এরকম অজস্র সাক্ষ্য উদ্ধার করা যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। আমাদের একটি মাত্র বক্তব্য, হঠাৎ এক শুভ প্রভাতে সুপ্তোত্থিত রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' রচনার সময় বার্গসঁর 'Creative Evolution'-এর ইংরেজি অনুবাদ পড়ে গতির ভাবলোকে প্রবেশ করলেন — এমন ধারণা অনৈতিহাসিক। আবার একমাত্র উপনিষদ্ থেকেই তাঁর গতির ধারণা তিনি পেয়েছিলেন এ-কথা বললে আধুনিক য়ুরোপীয় মননের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় অস্বীকার করে তাঁকে উপনিষদের ঋষি বলে ঘোষণার অন্ধ জাত্যভিমান প্রশ্রয় পায়, কিন্তু সত্যের অপমৃত্যু হয়। তিনি কিনা সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা দেবনন্দনঃ ! সকল উপনিষদের গাভী দোহন করেছেন দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের এই কনিষ্ঠ পুত্র! এরকম একদর্শী ভাষায় কথা বললে সত্য থেকে আমরা বিচ্যুত হব। অথচ এমন সত্যভ্রংশের দৃষ্টান্ত যত্রতত্র সুলভ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি' উপদেশটিকে কবির গতিভাবনার উৎস ভেবে নিমীলিত লোচনে আমরা রোহিতের উদ্দেশে ইন্দ্রের প্রেরণা সঞ্চারিণী কথাকে বলে থাকি উপনিষদের বাণী! একদল রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় ঋষি বলে এবং আরেকদল য়ুরোপীয় মননের দ্বারপ্রান্তে অধমর্ণরূপে তাঁকে দেখিয়ে 'যস্য যাদৃশী ভাবনা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' সূক্তির উদাহরণ হিসেবে নিজেদের হাজির করেন।

রমাপ্রসাদ চন্দের সঙ্গে একমত হতে না পারলেও তাঁকে এই দুই দলের কোনওটিরই অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না। যাঁকে ঐতিহাসিক হিসেবেই জানতাম, তিনি দর্শনে ও সাহিত্যে গভীর প্রবেশের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক আলোচনায়। কোঁতের পজিটিভিজম সম্পর্কে দার্শনিক বিশ্লেষণও তাঁর লেখায় আছে। রবীন্দ্রনাথের মানবিক ভূমার ধারণায় তিনি যে অসংগতি দেখতে পেয়েছেন, ঠিক এই জিনিসই আবু সয়ীদ আইয়ুবের কাছে অসংগতি মনে হয়নি। তিনিও তাঁর 'পান্থজনের সখা' বইটিতে কবির ব্যাখ্যাত 'মানুষের ধর্ম' প্রসঙ্গে কোঁতের সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা তুলে লিখেছেন: 'নাকি রবীন্দ্রনাথ কোঁৎ-এর সঙ্গে একমত হয়ে ভক্তি ও পূজার পাত্র ঠাওরেছিলেন 'Sum-total of all dead, living or future human beings'-এর কথা।'[6] কোঁতের Religion of Humanity-র আলোচনায় Hoffding তাঁর A History of Modern Philosophy গ্রন্থে লিখেছেন, 'যে-মানবধর্মের প্রবর্তক রূপে কোঁৎ নিজেকে মনে করতেন, সে-ধর্ম বিরাট সত্তারূপে মনুষ্যত্বের পূজা। এই বিরাট সত্তায় সকলে অংশ নিচ্ছে, তারা যোগ দিচ্ছে মৃত, জীবিত ও ভবিষ্যতের সকল মানুষের সমষ্টিরূপে, তারা ছোটো বা বড়ো গোষ্ঠীতে সকলে মানুষের পবিত্রতা ও প্রগতির জন্য স্বেচ্ছায় পরিশ্রম করছে।'[7] অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যত মানুষ ছিলেন, আছেন ও জন্মাবেন — তাঁদের সমষ্টিগত ভাবনা কোঁতের দর্শনচিন্তার একটি মূল ভিত্তি। কেন না ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে শুধু মানুষকে নিয়ে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন ছিল তাঁর লক্ষ্য। তবে এ-কথা সত্য, কোঁতের সমষ্টিগত মানবভাবনা তাঁকে শেষ জীবনে মিস্টিক করে তুলেছিল। তাঁর ভাবনা তখন এক রহস্যময় অনুভবে পরিণত হয়েছিল। এ-সব ভাবনা তাঁর অনুগামীরা বিশেষ নেননি, তাই প্রচারও বিশেষ হয়নি। জন স্টুয়ার্ট মিল August Comte and Positivism নামে যে বই লিখেছিলেন তাতে তিনি কোঁতের জীবনের শেষ দশ বছরের লেখা তাঁর বিবেচনার বাইরে রেখেছেন।[8] মিলের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র জন স্টুয়ার্ট মিল নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে 'মিলকৃত কোম্‌ৎভাষ্যে' 'জনসমাজের কথঞ্চিৎ ক্ষতি'[9] হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের ধারণা, মিল কোঁতের শেষ দশ বছরের রচনা তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেননি বলেই বঙ্কিম এমন মন্তব্য করেছেন। শেষজীবনে কোঁৎ বুদ্ধির উপরে তাঁর হৃদয়কে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর অন্য এক নারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্ভব না হলেও আত্মিক মিলন ঘটেছিল। এই ঘটনা তাঁকে এক নতুন মানুষে পরিণত করে। এই অন্য নারীর সঙ্গেও তাঁর মিলন স্বল্পকালস্থায়ী হয়। মহিলার মৃত্যুতে সে মিলনে আপাত ছেদ পড়ে। কিন্তু যেভাবে তাঁর সমাধিতে তিনি যেতেন এবং মৃতার সঙ্গে যোগ অনুভব করতেন, তাতে কোঁতের জীবনদর্শন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন তাঁর মনে হয়েছিল, কোনও এক মৃতা বা জীবিতা মহিলার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা সকল পুরুষের জীবনে পরম মূল্যবান। কিন্তু তাঁর এইসব মিস্টিক অনুভব বিশেষ প্রচারিত হয়নি। তাঁর কঠোর যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞাননির্ভর দর্শনই সর্বসাধারণের মধ্যে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি এই সুদূর বাংলায় গত শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অনন্য মনীষী থেকে আরম্ভ করে যোগেশচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য পর্যন্ত অনেকেই তাঁর পজিটিভিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির দার্শনিক মনীষায় উজ্জ্বল দ্বিজেন্দ্রনাথ পজিটিভিজমের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বঙ্কিমও কোঁতের প্রভাব থেকে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকের এই ভাবপরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথের যৌবন কেটেছে। তাই কোঁতের দর্শনের সঙ্গে তাঁর সে-সময় পরিচয় স্থাপন স্বাভাবিক। কম হলেও দুয়েক জায়গায় তাঁর লেখায় এই দার্শনিকের উল্লেখ আছে। কিন্তু The Religion of Man ও 'মানুষের ধর্ম' রচনার সময় আবার নতুন করে তাঁর কোঁৎচর্চার কোনও বাহ্য প্রমাণ নেই। রবীন্দ্রভাবনা ও অনুভবের বিবর্তন অনুসরণ করে আমাদের ধারণা হয়েছে যে মানুষের ধর্মের ব্যাখ্যা তাঁর স্বকীয় উপলব্ধিজাত, আর তাতে নাস্তিকতার পরিচয় মেলে না, অজ্ঞেয়বাদের সুরও বাজেনি।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের আলোচনায় 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রসঙ্গ প্রায়ই ওঠে। এখানকার শচীশ ও শ্রীবিলাসের চরিত্রে প্রতিটি ব্যক্তির স্বধর্মসন্ধানের পতনে অভ্যুদয়ে বন্ধুর পথ আঁকা হয়েছে। জ্যেঠামশাই জগমোহন তাঁর নিরীশ্বর মানবকল্যাণের ধর্মে তাঁর জীবনের সত্য পেয়েছিলেন। 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনকেই তিনি ধর্ম বলে মানতেন। বেন্থামের হিতবাদ ও কোঁতের ধ্রুববাদের উপকরণে জগমোহনের মন গড়ে উঠেছিল। নিঃসন্দেহে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে এই চরিত্র রবীন্দ্রনাথের হাতে পরমশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক ভুলে যাননি যে জগমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ মনে গূঢ় অনুভবের দিক্‌টি উপেক্ষিত ছিল। ভাইপো শচীশ বাধ্য হয়ে জ্যেঠামশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সেদিনকার নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় জ্যেঠামশাই বুকভরা

বেদনায় মেঝের উপর শুয়ে পড়লেন। তাঁর ব্যথিতচিত্তের কথায় লেখক লিখেছেন: 'হায়রে, প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন! মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক দুই তিনের কোঠায় ফেলা যায়? সে যে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল'। ননিবালা তার বিবাহ বা আত্মহত্যার আগে জগমোহনের আশীর্বাদ চায়, তখন তিনি যুক্তিনিষ্ঠ নিরীশ্বর মনের পরাভব স্বীকার করে এই মেয়েটিকে বলেন, 'মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়ো বয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।' 'চতুরঙ্গ'র এই দু'টি উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথের ধারণার আভাস মেলে না? মানবধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসের কোনও বিরোধ নেই বলেই তাঁর ধারণা ছিল।

বরং জগৎ ও জীবনের প্রতি অপার ভালোবাসাই তাঁকে ঈশ্বরবিশ্বাসী করে তুলেছে। কেন না ভালোবাসার মধ্যে তিনি চিরকাল এক রহস্য অনুভব করেছেন। এই 'শ্যামল সুখের ধরা', এখানে 'কালো মাটির বাসা'য় কবির বাস, এখানকার আকাশে মেঘের পর মেঘ জমে, মেঘ থেকে জল ঝরে ঝরঝর, কে যেন 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' গোপন চরণ ফেলে আসে। আমাদের এই 'শ্যামল সুখের ধরা'র যেখানে যা কিছু দৃশ্য-গন্ধ-গান, সেখানে কবি এক অধরাকে পালিয়ে যাওয়ার পথের বাঁকে বাঁকে চকিতে দেখেন, তার নূপুর নিক্কণ শোনেন, কখনও-বা সে এসে পাশে বসে, ঘুমের ঘোরে কবি জাগতে পারেননি বলে পরে অনুতাপ জাগে। ধরার মধ্যেকার এই অধরাই গীতাখ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর। তাঁর সঙ্গে কবির হৃদয়ে চলে রসের লীলা। তাঁকে তিনি প্রভু নাথ, পিতা, বন্ধু বা বঁধু, সখা-এমনিতর নানা সম্বোধনে আহ্বান জানান। এ-সব গানে প্রেম, নিসর্গ ও ভক্তির স্পর্শ লেগে এমন হয়েছে যে এই গানগুলি শুধু ভক্তির গান হয়ে থাকেনি, অনায়াসে নিসর্গ বা প্রেমের গান হিসেবেও আস্বাদিত হতে পারে। এমন কি এসব গান আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতো ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মনেও আবেদন সৃষ্টি করে। 'আলোয় আলোকময় করে হে/এলে আমার আলোর আলো' — গীতাঞ্জলির 'এই কবিতাটিতে 'আলো' বলতে কী বোঝাচ্ছে তা অস্পষ্ট বলেই অনাস্থার অপনোদন ঘটে, আমরা তৎক্ষণাৎ অতিসহজে কবির কাছে আত্মসমর্পণ করি'।[10] এই উক্তিতে বুদ্ধদেব বসু 'অনাস্থা' বলতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরে অবিশ্বাসই বুঝিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত কবি বলেই ভক্ত সাধকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেননি। আর এজন্যই তাঁর কবিতার আবেদন অনেকান্ত। এমন কি গতযুগের বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও তাঁর গানে ও কবিতায়, এমনকি তাঁর ঈশ্বরভাবনাসম্পৃক্ত সৃষ্টিতেও তাঁদের আত্মত্যাগের ও দুঃখবরণের উৎসাহ পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও এসব গান ও কবিতাকে কবির ঈশ্বরানুভবমুক্ত বলার উপায় নেই। তাঁর ঈশ্বরানুভবের জন্য আমাদের লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই, এমন কি আমাদের মধ্যে যাঁরা নাস্তিক, তাঁদেরও নয়। বরং এই ভেবে তৃপ্ত হওয়া উচিত যে তিনি এত বড় কবি যে তাঁর গূঢ় অনুভবকে ছাপিয়ে নানাদিকে আবেদন সৃষ্টি করছে তাঁর গান ও তাঁর কবিতা।

একটি কথা সত্য যে 'বলাকার' পরে তাঁর কবিতায় ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রভু, নাথ, পিতা জাতীয় সম্বোধন বিশেষ শুনিনি। যদিও একেবারে নেই, তা নয়; যেমন 'প্রভু' সম্বোধন আছে 'বীথিকা'র 'নমস্কার' কবিতায়, বিশ্বস্রষ্টাকে কর্ণধার রূপে কল্পিত হতে দেখি 'সানাই' কাব্যের 'কর্ণধার' কবিতায় অথবা 'সম্মুখে শান্তিপারাবার' গানে। 'বলাকা' পর্ব থেকে ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরের ধারণার স্থলে নৈর্ব্যক্তিক আর তাই সকলজনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট মানবসর্বস্ব এক পরম সত্যের ধারণার দিকে তিনি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সত্যকে প্রিয় বা অপ্রিয় বলা অর্থহীন। কর্ণধার, প্রভু, পিতা নোহসি ইত্যাদি বলার অবকাশই এখানে নেই। ঈশ্বরের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছিল। তার অর্থ কখনওই এ নয় যে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রভু, নাথ ইত্যাদির পরিবর্তে শেষপর্বে তিনি তাঁর উপলব্ধ পরম সত্যকে 'আরোগ্য'র ২ এবং 'জন্মদিনে'র ২৭ সংখ্যক কবিতায় 'চিরমানব', নবজাতক' বইটির 'জয়ধ্বনি'তে 'চিরন্তন মানব', 'শেষ লেখা'র ৬ সংখ্যক কবিতায় 'মহামানব' বলেছেন। The Religion of Man ও 'মানুষের ধর্ম' বই দুটিতে Universal Man, Man the Eternal, পূর্ণমানব, সর্বজনীন মানব এরকম নানা নামে অভিহিত করেছেন। 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/ থেকে যায়' — জীবনানন্দের এই অনুভবও রবীন্দ্রসম্মত। শুধু 'মানুষের মৃত্যু হলে' কবিতায় নয়, এমন অনুভবে আকীর্ণ জীবনানন্দের অনেক কবিতা যেমন 'মানব ক্ষয়িত হয় না জাতির ব্যক্তির ক্ষয়ে' (যতদিন পৃথিবীতে: বেলা অবেলা কালবেলা), 'দেখেছি মানুষ অনর্গল ম'রে/মানবকে তার প্রতিনিধি রেখে গেছে' (সূর্যকরোজ্জ্বলা: আলো পৃথিবী)। 'মানুষ' বলতে বোঝানো হচ্ছে ব্যক্তিমানুষ, আর 'মানব' মনুর অপত্যধারা যার পতন নেই।

ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু হলেও চিরকালীন মানব থেকে যায় — এই বিশ্বাস থেকেই শুভ্রমানবিকতার ভোরের স্বপ্নে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ'র 'শিশুতীর্থ' কবিতার শেষে দেখতে পেলেন — 'মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু/উষার কোলে যেন শুকতারা'। এই শিশুকেই একই সঙ্গে বলেছেন 'চিরজীবিত' ও 'নবজাতক'। এই শিশু চিরজীবিত, কেন না সে মানুষের ঘরে পুনঃ পুনঃ জায়মান, ফিরে ফিরে জন্মাচ্ছে, ভবিষ্যতেও জন্মাবে।

অন্যপ্রাণীদের শিশু শুধু পিতৃধর্মের পুনরাবৃত্তির জন্য জন্মায়। একমাত্র মানুষের ঘরে শিশু জন্মায় পিতাকে তার অপূর্ণতা থেকে মুক্তিদানের জন্য, পিতার ভুললান্তির পুনরাবৃত্তি না-করার আশ্বাস নিয়ে তার জন্ম। এজন্যই মানুষের নিরন্তর অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। 'শিশুতীর্থ' কবিতার শিশু পরিত্রাতা নয়, অবতার নয়, অধিনায়কতে হত্যা করায় অনুতাপদগ্ধ আত্মশুদ্ধ চেতনার নামান্তর, মানুষের অগ্রগতির একটি ধাপমাত্র। পরিত্রাতা অবতারে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে সদ্যোজাত পুত্রকে দেখে লোকে বলে 'অহো, তুমি পিতাকে অতিক্রম করেছ, অহো, তুমি পিতামহকে অতিক্রম করেছ।'[১১] পিতা ও পিতামহ যা হতে পারেননি, তা হওয়ার আশ্বাস নিয়ে মানুষের ঘরে শিশুর জন্ম। ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু হলেও সামূহিক মানবের মৃত্যু নেই। সামূহিক মানবের অক্ষয় অব্যয় অমর রূপের ভাবনা থেকে উপনিষদের ব্রহ্মভাবনাকে খুব দূরের ভাববার কারণ নেই। বৃহদারণ্যকোপনিষদের শেষদিকে যেভাবে বংশপরম্পরার কথা বলা হয়েছে এবং এই বংশপরম্পরার মধ্য দিয়ে মানুষের নিরন্তর উৎকর্ষের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তাতে সামূহিক মানবের ধারণা ব্রহ্মের মতোই এক উত্তুঙ্গ স্তরে উন্নীত হয়েছে। সত্য কথাটা হচ্ছে, উপনিষদকে আমরা যেমন জীবনবিমুখ ভাবি, তেমনটি রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি। অন্তত উপনিষদের জীবনমুখী ভাবনাচিন্তাই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথের মানবব্রহ্ম বা মানবিক ভূমার আলোচনায় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের শুধুই কৌতের Grand Etre-র কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল না বৃহদারণ্যকের কথা। তাতে আমরা বিস্ময় বোধ করছি। রবীন্দ্রনাথের সারগ্রহিষ্ণু মন প্রাচীন ভারত থেকেও যেমন পেয়েছে, তেমনি আধুনিক য়ুরোপ থেকেও পেয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, যা পেয়েছে তাঁর সংশ্লেষণী মন সবকিছু নিজের করে নিয়েছে।

চন্দ মহাশয়ের ধারণা, 'বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকান্তরে গ্রহচন্দ্রতারায়' — 'মানবসত্য' ভাষণে এই বাক্য যে-অনুচ্ছেদের গোড়ায় আছে, তারপরের অনুচ্ছেদেই নিখিল মানবের আত্মা উদ্ভীর্ণ হয়ে 'কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন তবে সেকথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেন না আমার বুদ্ধি, মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা' — এ-সব কথা বলে রবীন্দ্রনাথ স্ববিরোধী হয়ে পড়েছেন। সমালোচকের আপত্তি যিনি অমানব বা অতিমানব নন, তাঁর আসন লোকে লোকান্তরে থাকা কিভাবে সম্ভব ? কবি তাঁর 'The Religion of Man-কে 'দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে' বলেছিলেন। 'মানুষের ধর্ম' সম্পর্কেও একই কথা সত্য। তাই দার্শনিক বিচারে স্ববিরোধ দেখানো কঠিন কাজ নয়। কবিচিত্তের সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রতি দরদ দিয়ে তাকালে দেখব, মানুষ নিঃসন্দেহে তাঁর চেতনায় অনন্য মর্যাদা পেয়েছে। তাসত্ত্বেও জগৎ ও জগদীশ্বর তাঁর চেতনায় অভিন্ন। প্রাণের মধ্যে যা ব্যক্ত, জড়ের মধ্যে তা অব্যক্ত। প্রাণ ও জড়ের ঐক্যবোধে তিনি অটল। আকৃতিতে না হলেও প্রকৃতিতে ঈশ্বরের যে-সব ভাবনা বিভিন্ন ধর্মে স্থান পেয়েছে সেগুলিতে বারবার তাঁর উপর মানবিক গুণাবলীই আরোপিত হয়েছে। কবির ভাষায়ই বলতে পারি মানুষের হৃদয় মানবহৃদয়, মানুষের কল্পনা মানবকল্পনা। তাই মানবগণ্ডী অতিক্রম মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর উপলব্ধ সত্য কোনো 'অমানব বা অতিমানব' নন। তার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে মানুষের মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনার পূর্ণ বিকশিত রূপের ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসের কবি। এই বিশ্বাসের সবটা জুড়ে আছে ঈশ্বরে ও মানুষে তাঁর বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে যে ঝড়ের ঝাপ্টা লাগেনি তা নয়। সেই ঝড় ঝাপ্টার মধ্যে তাঁর বিশ্বাসের দীপ তিনি নিভে যেতে দেননি। তাঁর জীবনের শেষ দশকে সমগ্র পৃথিবীতে যে-সংকট ঘনিয়ে এসেছিল, ব্যক্তিজীবনে যে-শোকতাপ ও রোগযন্ত্রণা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল, তার মধ্যে শুধুই সহজ বিশ্বাস তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এই বিশ্বাস প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁকে প্রতিমুহূর্তে জয় করতে হয়েছে। 'গীতালি'র 'মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে' কবিতার শেষে 'পূর্ণের পদ-পরশ' জীবনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির উপর ঝরে পড়ছে বলে গভীর বিশ্বাসবশে তিনি বলেছিলেন। সে ১৯১৪-র কথা। আর ১৯৪০-এ এসে 'রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থের ১১ সংখ্যক কবিতায় সেই একই পূর্ণের কথা বলেন। কিন্তু সে-পূর্ণ শুধুই সহজ বিশ্বাসের নয়, রীতিমত বিজিত বিশ্বাসের পূর্ণ — 'দারুণ ভাঙন এ যে পূর্ণেরই আদেশে ;/ কী অপূর্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে'। ভূপৃষ্ঠের জড় গঠনে যেখানে একটি রেখার কণামাত্র ভুল, প্রাণবিম্বে যেখানে 'অপর্যাপ্ত শক্তির সম্বলে' মত্ততা, সেখানেই ঋতের অমোঘ বিধানে পৃথিবীর গূঢ় অভ্যন্তরে জমা হয় 'অক্ষমা'। বৈদিক 'ঋত'র মূল অর্থ ন্যায়নীতির অমোঘ বিশ্ববিধান। সেই বিশ্ববিধানে যেখানেই শান্তি বিঘ্নিত, অত্যাচার সর্বগ্রাসী, সেখানে নেমে আসে ক্ষমাহীন রোষ। তখন 'পূর্ণেরই আদেশে' চলে 'দারুণ ভাঙন'। ভাঙন শেষে আবার নতুন সৃষ্টি। ন্যায়নীতির অমোঘ বিধানদাতা ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতিরেকে পূর্ণের ধারণা কোনও ভিত্তি পায় না। এমনও মাঝে মাঝে ঘটে যে ক্ষমতামত্ত অন্যায়লিপ্ত মানুষ বুদ্ধিভ্রংশবশত তার পতন নিজেই ডেকে নিয়ে আসে — 'আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা' — 'রোগশয্যায়' ৩৮। শেষ পর্যন্ত ন্যায়নীতির মর্যাদা রক্ষিত হয়। কবির এই বিশ্বাসের শেষ প্রমাণ মেলে তাঁর শেষ জন্মদিনের ভাষণ 'সভ্যতার সংকটে'। সেখানে প্রবলপ্রতাপশালীর উদ্দেশে 'বিনিপাত' উচ্চারণ করে মনুসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি যা বলেন, তার বাংলা মর্মার্থ —'অধর্মের দ্বারা মানুষ বেড়ে ওঠে, অধর্ম থেকে কল্যাণ দেখে,

অধর্মের দ্বারা শত্রু জয় করে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পায়'। বিশ্ববিধাতায় বিশ্বাস না করলে 'সমূলে বিনাশ পায়' কথাটা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তবুও আবার বলি অনেক দুঃখ, অনেক অশান্তি, অনেক পাপের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপের ওপারে কবি যে 'প্রকাশ সুষমা' অনুভব করেছেন, 'বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারাকে ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হতে দেখেছেন, তার জন্য তাঁকে সেক্‌স্পীয়রের ভাষায় বললে পেরিয়ে আসতে হয়েছে wheel of fire, জীবনানন্দের ভাষায় বললে তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে 'আগুনের মহান্ পরিধি'।

সূত্রনির্দেশ —

১. মনে হয়, সত্তা-জিজ্ঞাসায় যেমন, তাঁর ঈশ্বর-জিজ্ঞাসাতেও তেমনি শেষ কথা — 'মেলে নি উত্তর' — রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগৎ, ধর্ম চিন্তা ; ভূমিকা — সত্যেন্দ্রনাথ রায়, গ্রন্থালয়, ১৯৮৯, ১১৪ পৃ।

২. আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭, ৭৮ পৃ।

৩. ঐ, ১৭৯ পৃ।

৪. অথচ এমন কথাই লিখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ রায় — 'আর বিশেষ করে ঔপনিষদিক জগৎতত্ত্বের কথাই যদি ধরি, তাহলে তা আদৌ গতিধর্মী নয়, তা অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্মের, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরম সত্তার তত্ত্ব — তার মধ্যে গতির কোনো অবকাশ নেই' — রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, গ্রন্থালয়, ১৩৮৭, ১২৪ পৃ।

৫. Indian Philosophy — S. Radhakrishnan, Vol I, Centenary Edition, 198 p.

৬. পান্থজনের সখা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪, ১৭০-৭১ পৃ।

৭. A History of Modern Philosophy — Hoffding Vol. I., Doller Edition, 357 P.

৮. August Comte and Positivism — John Stuart Mill. 1st edition as an Ann Aober paperback, 1961, 6 p.

৯. বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ২য় খণ্ড ১৩৬৬, ৮৮১ পৃ।

১০. কবি রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৬, ৭৬ পৃ।

১১. উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, উদ্বোধন, ৩য় ভাগ, চৈত্র, ১৩৬২, ৪৭০ পৃ।

দুটি সনেট

আল মাহমুদ

তোমাকে যতই দেখি গ্যাসের শিখার পাশে, নীল
শাড়ির আঁচল ফেলে রাঁধো বসে প্রত্যহ প্রোটিন
ডালে দাও রসকষ, বেগুনে ভর্তায় বাটা তিল
আহারে আরামে কাটে অমলিন আরও এক দিন।

অবসর ? কাকে বলে অবসর ? অফুরন্ত দেখার বিষয়
আপন বোতাম খুলে শোণিতের তরঙ্গ দেখায় ;
কবির তো কাজ শুধু দেখে যাওয়া, প্রলয় বিলয় —
শিখে নেয়া সবকিছু, কালচক্র যা কিছু শেখায়।

তবু মানি ক্লান্তি আসে। ক্লান্ত এই দেহ মহাশয়
কেবল কবর যাচে। কিন্তু এক অবিশ্রাম আমি
শরীর ছাপিয়ে গিয়ে গেয়ে ওঠে আমারই বিজয়
আলোর গতির চেয়ে সেই আমি আরও দ্রুতগামী।

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতই
আধার ছাপিয়ে যায় আত্মা এক অনন্ত অথৈ।

সফরসঙ্গিনী এক ছিল বটে আহারে মৈথুনে
গ্যাসের শিখার তাপে জ্বাল দিত পার্থিব সালুন ;
সেই ঘাট পার হয়ে অনন্তের সিঁড়ি গুনে গুনে
এখন যে খাদ্যে যাব সে আহারে লাগবেনা নুন।

লাগেনা আগুন পানি, প্রতীক্ষায় দগ্ধ মুখখানি
নির্বাক নয়ন মেলে কবিতার কর্তব্যে সজাগ
বসে থেকে বলবেনা, এই ঝাল, এইখানে পানি
পরিতৃপ্ত হয়ে এসো আরও দেব শয্যার সোহাগ।

বাসি বকুলের মত সে মালা শুকিয়ে গেছে কবে
ভুলে গেছি মুখখানি, যৌবনের চিহ্ন কতিপয়
বিদেশী বাজারে এসে ভুলে আছি নিজেরই বৈভবে
তবু সে ফুলের গন্ধে জর্জরিত আত্মার বিষয়।

তবে কি তোমাকে ছাড়া মোনাজাতও ঠেকে না কিনারে ?
পার্থিব দেহে[illegible] ডুকরে ওঠে মেঘের মিনারে।

বাড়ির নামটি জলপ্রপাত

আনন্দ ঘোষ হাজরা

[মহাকাশ বিজ্ঞানী রজার পেনরোজের পরিকল্পনায় শিল্পী এম. সি. এশারের আঁকা 'ওয়াটারফল্' এবং 'অ্যাসেনডিং এন্ড ডিসেনডিং' নামক দুটি ছবির অনুলিপি দেখে]

বাড়ির নামটি 'জলপ্রপাত'

প্রবহমান সময়কালের আকাশ জুড়ে
ছুঁচ্ছে মাথা.........
পাহাড় বেয়ে নামছে নীচে
ঝর
    ঝর
        ঝর
ঝরছে যেন পাগলাঝোরা
ঝাঁপাচ্ছে খুব দেওয়ালগুলো
অথচ সব স্থির জ্যামিতি।
অনেকগুলো বর্গক্ষেত্র গোলবৃত্ত
উপর নীচে জমাট বাঁধা
কেলাস যেন ;
নামছে দ্রুত ?
    নামছে দ্রুত ?
অথচ সব স্থির জ্যামিতি।

বাড়ির নামটি 'জলপ্রপাত'
'ওঠা-নামা'ও বলতে পারো
কোন জ্যামিতি উর্ধ্বে ওঠে
কোন জ্যামিতি হঠাৎ নামে
এ এক ধাঁধা !
নাকি ঘরের বাসিন্দা সব
উঠছে
    নামছে
ঝুলছে
    শূন্যে
নাকি সবাই গড়িয়ে পড়ে ?
অথচ সব স্থির জ্যামিতি।

বাড়ির নামটি 'জলপ্রপাত'
'ওঠা'-নামা'ও বলতে পারো।

কালান্তর

পরিমল চক্রবর্তী

আলোটা সরিয়ে নাও,
মালা গাঁথা বন্ধ করো,
স্মৃতি এবার ঘুমোতে চায়।

আমার সামনের আকাশটা আজ
হা-করা প্রকাণ্ড একটা অজগরের মতো
গর্জন করছে ;
আমি এক সর্বনাশা নেশায় বেহুঁস... মাতাল —
ভয়ঙ্কর তরঙ্গের চূড়োয়-চূড়োয়
আমার সমগ্র সত্তা আজ দাপাদাপি করছে।

অথচ একদিন ছিলো
যখন আমার মনেও স্বপ্নের ফুলঝুরি ঝরতো ;
সমস্ত সংসারটাকেই মনে হতো
যেন রামধনুর সাতরঙে রাঙা
অথচ, আশ্চর্য,
আজ আর সেই দিন নেই,
সেই রাতও নেই ;
আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল... ভাঙাচোরা ... ক্রমমজ্জমান।

আলোটা সরিয়ে নাও,
মালা গাঁথা বন্ধ করো,
স্মৃতি এবার ঘুমোতে চায়॥

পরিহাস

গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়

জল ঝরে, ধ্বস নামে বুকের গভীরে চাসনালা
বনবাস থেকে ফিরে এসো অযোধ্যার মাঠে
রামজন্মভূমি প্রকীর্ণ জ্যোৎস্নায়
দ্যাখো, মানুষের শরীরে যন্ত্রণা
সে কেমন নীল আকাশের মতো।
নীলকণ্ঠ পাখি নেই।
কালো গোলাপের কুঁড়ি অজস্র বিস্ফারে ফোটে
মলোটভ ককটেলে পরী হারানোর দেশে
জ্বলে সাজানো বাগান। ঘুণ-ধরা প্রত্যয়ের গথিক খিলান
ভেঙ্গে পড়ে। দেশে দেশে ইন্দ্রজাল পেতে
মানুষের সর্বনাশ ছেনে তুলে
অনেক অনেক কাল কেটে গ্যাছে।
এবার তৈরী হও বুমেরাং জুতুগৃহে,
আগুনের জামা পরো — দমকলে
পাগলা ঘন্টির শব্দ
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে বনের হরিণ,
গ্যাসে ভাসে অজস্র ভূপাল।
দ্যাখো, বারবার কেঁপে ওঠে কেপ কার্নিভাল!

প্রভুত্ব

রেজাউদ্দিন স্টালিন

আমাকে শর্তের শেকলে বেঁধে বললো ভালোবাসো,
বললো শৃঙ্খলিত তোমাকে সরাতে হবে শুকনো পাতার স্তূপ।

কালো রুমালে জখম আমার দৃষ্টি
তবু বললো দ্যাখো মাথার ওপর আকাশ নীল
সেখানে যূথবদ্ধ নক্ষত্রের উল্লাস,
জ্যোৎস্নায় অপ্সরীদের অনন্ত নৃত্য।
নির্দেশের নির্মমতায় কণ্ঠদেশ আটকে দিয়ে বললো :
পাঠ করো স্তোত্র, প্রশংসা করো, নিরবিচ্ছিন্ন নামগান করো।

ক্ষুধার্ত আমাকে দেয়া হলো —
আকাশের উনুনে সেঁকা সূর্যরুটি,
আর পিপাসায় উদ্গলন্ত লাভাজল,
পুষ্পের বদলে আমাকে নিতে দেয়া হলো ভস্মের ঘ্রাণ,
প্রতিটি পদক্ষেপের সামনে তুলে দেয়া হলো লোভপাত্র।

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এইভাবে খুন করা হলো ;
গোধূলির সবগান মুছে দেয়া হলো,
পাখিদের শোভাযাত্রা ভেঙে দেয়া হলো,
বৃক্ষের বিরহ বোঝে এমন হৃদয় হত্যা করা হলো।

আমার চোখ দিয়ে রোদনাশ্রুর বদলে ঝরে পড়ছে অগ্নিজল,
হাসির বদলে অবোধ্য ধ্বনির ওঙ্কার।
এখন আমি সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়বিহীন, অনুভবহীন,
অভ্রান্ত সব নির্দয় নিয়মে
এবং যে কোনো নির্মম আদেশের অধীন।

শুধু অমান্য করেছি শর্ত সাপেক্ষ
ভালোবাসার নির্দেশ।

বিভূতিভূষণ

মতি মুখোপাধ্যায়

হলুদে পাখিটা আজও বসে নাকি কঞ্চির ডালে
কালমেঘ বন থেকে অনলস ঝিঁ ঝিঁ ডাক শুনে
থমকে দাঁড়ায় চাঁদ, লজ্জাবতী নিচে ইচ্ছামতী
বুকে যার লেবু-বন বৃষ্টি এলে কস্তুরী হরিণ।

এইসব দৃশ্যে যেন কোথাও নিভৃতে তুমি থাকো
ফুলকিয়া বইহারে, হাঁটো লবটুলিয়ার পথে
মাইল মাইল দীর্ঘ সারান্তার শ্বাপদ আঁধারে,
নির্জনতা ভালোবেসে কোইনার জলে ভেসে যাও।

বনকুসুমের ঝোঁপে আধো ঘুমে লক্ষ্মী পেঁচা ডাকে
স্বপ্নময় দিনগুলি বেত্রবতী করে পারাপার
নিশ্চিন্দিপুরের মাঠে ছুটে যাও রেলগাড়ি দেখে
বনের মাথায় দ্যাখো নীলফুলে দ্বিতীয় আকাশ।

শহরের বিষধোঁয়া তাড়া করে ফিরেছে কি তবে
পলাতক বালকের ইচ্ছা হয়ে পাহাড়ে ও বনে
পদ্মে ঢাকা যৌবনের মধুখালি বিল ছেঁচে নিয়ে
খুঁজেছো কি অভিজ্ঞান যা খেয়েছে রক্তচোষ রুই।

লতায় পাতায় তুমি নীলরোদ শ্যামা বাঙলার
খইফোটা জোৎস্নায় দেবযানে নিচে নেমে এসো।

ধ্বনিময় জন্মদিন

মঞ্জুভাষ মিত্র

খুব প্রিয় কেউ প্রবাসে গিয়েছে। আমি অন্যমনস্কভাবে
রবীন্দ্রসরোবরে নেমে এদিক ওদিক ঘুরে তারপর
চেনা দরজায় হাত রাখি ; আমার বুকের কাছে সূর্যমুখী
ধ্বনিময় জন্মদিন ঢেউ তোলে খেলা করে স্বর ও ব্যঞ্জনে
সুন্দর মানুষটিকে আজ কেন খুব বেশী পড়ে গেল মনে
আমার হৃদয় যেন সেই পথিকের সঙ্গে ভ্রমণে গিয়েছে
নদী সাঁকো সিন্ধুতীর ছুঁয়ে ধাবমান নূতন মোটরে
সে যাবে অম্লান এক কুঞ্জবনে ঘেরা মায়াবীশহরে
সে হয়তো চলে যাবে আঙুর, আপেল গাছভরা ক্যালিফোর্নিয়ায়
তার সাথে দেখা হ'ল চেনা হ'ল একদিন এ কলকাতায়
ভাবলে অবাক লাগে, মনে হয় তবু তাকে চিনিনি কখনো
এ মুহূর্তে সে গল্প কবিতা লিখছে না কি, অথবা নারীর
শাশ্বত বিষয়ে মগ্ন ? তার মুখের উজ্জ্বানে কত রাত্রির পরিশ্রম
বৃষ্টি বসন্তের দিনে তাকে মনে হয়েছিল সখা, গুরু, প্রার্থিত মনোরম
কত দিবসের অতন্দ্র প্রয়াসে আজ প্রতিভা কি ফোটালো গোলাপ ?
বিশ্বপৃথিবীর কাছে ভালোবাসার অক্ষর প্রবাহিনী নিয়ে সে গিয়েছে
একদিন সে ছিল নদীর নিকটে এক লাজুক বালক
ফিরে এলে তার সঙ্গে ঠারে ঠোরে ইঙ্গিতে উঠবে জমে আমার আলাপ

অস্তিত্বের মহড়া

রবিউল হুসাইন

কিছু কিছু দুঃখ আছে একেবারে বটগাছের মতন ব্যাপ্ত, বিস্তৃত

কর্কট অসুখ এক সুখের মনোরম রোদকে আটকিয়ে
দুঃখের নিবিড় ছায়া দ্যায়
দুঃখের ঝুরিগুলো নেমে যায় মাটি আর ঘাস বরাবর
মানুষের চৌখুপী ঘরগুলোকে গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরে
পঞ্চমূল বাহুলতা দিয়ে, কণ্ঠনালীকে অক্লগরের নম্র-কুশলতায়
পেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী খবর ভালো তো !

এইরূপ খেলাধুলো, হাঁকডাক, প্রকৃতির নিজস্ব জীবনী থেকে
জানা যায় — এগুলো তার বৈষয়িক কৌশল
এরকমই অস্তিত্বের মহড়া — এভাবেই টিকে থাকে,
টিকে থাকতে হলে এই বিধি অনুসরণ ছাড়া আর
কোনো পথ খোলা নেই তার

যদ্দিন জীবন, তদ্দিন এই নীল বেদনার সীমাহীন পথ
দুঃখ আর যন্ত্রণা শুধু উদ্ভিদ আর জীবজন্তুর — মানুষের,
অনাসবের বেলায় রূপান্তর আর পরিবর্তনের
সাপ-লুডু খেলা,
পরিশেষে সবপথ এক অমোঘ মনোবিন্দুতে মিশে যায়

সুখ আর দুঃখ তখন বরফের গুঁড়ো হয়ে
ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে অস্তিত্বের অসহায় মাথায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, গ্যাট ও ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

ধীরেশ ভট্টাচার্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্ঞান, এই উভয় শাস্ত্রেই কিছু মহান উদ্দেশ্যর কথা আলোচনা করা হয়, বাস্তবে যার প্রয়োগের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়। ফরাসি বিপ্লবে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার এক আদর্শ রূপ কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে-দেশে এক প্রবল স্বৈরতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। অহিংসা ও গণতন্ত্রের মধ্যে সুদৃঢ় মেল-বন্ধনের কথা আদর্শ হিসেবে অতি উত্তম ও যুক্তিগ্রাহ্য। বাস্তবে দেখি, কোথায়ও সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা আক্রান্ত সংখ্যালঘুর কণ্ঠরোধ, আবার অন্যত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নৈরাশ্য থেকে উদ্ভূত হিংসাশ্রয়ী বিক্ষোভ।

ধনবিজ্ঞান বহুকাল ধরে যে আদর্শটিকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে তাকে বলা যেতে পারে নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যক্তিতান্ত্রিকতা। ব্যক্তির অভিরুচি অনুযায়ী উৎপাদন ও বাণিজ্য করার নির্বাধ স্বাধীনতা একটি দেশ ও সমাজকে ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পেতে সবিশেষ সাহায্য করবে, আর এই স্বাধীনতা অবদমিত হলে দেশের সামগ্রিক স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়বে — এমন একটি বিশ্বাস জন্মলগ্ন থেকেই ধনবিজ্ঞানের চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের জন্য ব্যবহারিক প্রয়োজনে এই বিশ্বাসের পথ ধরে চলা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথাই যদি ধরি, তাহলে দেখা যাবে বিনা নিয়ন্ত্রণে এই বাণিজ্যকে বিস্তার লাভ করতে দেওয়া প্রায় কোনও দেশের পক্ষেই নিজের স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করা হয়নি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন জানানো হয় একাধিক কারণে। প্রথম কারণ, বাণিজ্য থেকে রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য রাজস্ব আদায় করা। যেহেতু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র হল নির্দিষ্ট কয়েকটি পোতাশ্রয় বা বিমানবন্দর, সেই কেন্দ্রগুলিকে সহজেই নজরে রাখা যায়। সেখান থেকে আমদানি বা রপ্তানির উপর শুল্ক বসিয়ে রাজস্ব আদায় করলে কর ফাঁকি দেবার সুযোগ থাকে না বললেই চলে। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্ব আদায়ের প্রায় ২০-২৫ শতাংশ পাওয়া যায় আন্তর্জাতিক পণ্য-ব্যবসায়ের উপর শুল্ক আরোপ করে। প্রধানত আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করাই রীতি, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রপ্তানির উপর শুল্ক আরোপ করার নজিরও লক্ষ করা যায়।

আমদানির উপর শুল্ক আরোপ করার ফলে স্বদেশের ক্রেতার কাছে আমদানি পণ্যের দাম বাড়ে। তখন বিদেশের বিক্রেতারা চিন্তিত হয়ে পড়ে তাদের উৎপন্ন সামগ্রীর বাজার সংকুচিত হয়ে যাবার ভয়ে। তারা তখন সাধ্যমত দাম কমিয়ে বাজারের চাহিদাকে জোরালো করে রাখতে সচেষ্ট হয়। এইভাবে আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দিয়ে এক দেশ অন্যান্য দেশের উৎপাদকদের উপর দাম কমাবার জন্য এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ঠিক একই উপায়ে রপ্তানি পণ্যের জোগান কমিয়ে দিয়ে রপ্তানি পণ্যের দাম চড়িয়ে রাখা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব হয়। কাজেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর শুল্ক নির্ধারণ করার আর এক বিশেষ কারণ হল, আমদানির ক্রয়মূল্য কম রেখে রপ্তানির বিক্রয়মূল্য বাড়াতে চেষ্টা করা। শুল্কের হার চড়িয়ে দিয়ে নিজের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করার এই খেলায় একযোগে সব দেশই অবতীর্ণ হলে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যেখানে কোনো দেশেরই আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, শুধু আন্তর্জাতিক পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রটি সংকুচিত হয়ে পড়ে।

কোনো কোনো অবস্থায় রপ্তানির বিক্রয়মূল্য বাড়াবার চেষ্টা না করে শুধু রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রার বাড়তি উপার্জনের উপর জোর দেওয়াকে বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়। তখন নানা উপায়ে রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন ও বিদেশের বাজারে তার বিক্রয়কে উৎসাহ জোগানো হয়। সরকার রপ্তানি পণ্যের উৎপাদকদের জন্য বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করে এবং রপ্তানিকারী সংস্থার জন্য ভরতুকির নিয়মকানুন প্রবর্তন করে রপ্তানির বাজারে নিজের দেশের স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে যেতে পারে। যে-দেশ সব চাইতে বেশি অনুদান ও ভরতুকির সংস্থান করতে সচেষ্ট হয়, স্বাভাবিক নিয়মেই সেই দেশের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দেশের রেষারেষির ফলে কোনো বিশেষ দেশই পুরোপুরি নিজের কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। শুধু দেশে দেশে বিরোধ ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

দেশীয় শিল্পের সাবলীল বৃদ্ধি নিশ্চিত করার আকাঙ্ক্ষায় অনেক

দেশ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। আমদানি পণ্যের বিকল্প বস্তু দেশের অভ্যন্তরেই তৈরি করিয়ে নিতে পারলে দেশীয় শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়ে, আর কর্মীরা নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, কর্মসংস্থান বাড়াবার জন্য এই বিশেষ পন্থাটি বেছে নেওয়া হয় কেন। রপ্তানির বাজারে প্রবেশ করতে পারার উপযোগী পণ্য নিয়ে শিল্পবিস্তারের চেষ্টা করতে অসুবিধা কোথায় ? এর সহজ উত্তর হল, রপ্তানির জন্য বিদেশের চাহিদার উপর নির্ভর করতে হয় আর তাতে সাফল্যের সম্ভাবনা যথেষ্ট অনিশ্চিত। সেই তুলনায় দেশের বাজারে আমদানি পণ্যের বিকল্প তৈরি করলে বাণিজ্যিক সাফল্যকে অনেক বেশি নিশ্চিত করা যায়।

তত্ত্বগতভাবে 'শিশুশিল্পের' সংরক্ষণ যে দেশের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপোষক তা স্বীকার করে নিলেও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই 'শিশু'রা সংরক্ষণের উপর ভরসা রেখে নিজেদের চিরকাল দুর্বল বলে ঘোষণা করে, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে তৎপর না হয়ে প্রাচীন উৎপাদন-পদ্ধতিকেই আঁকড়ে থাকে এবং পরিচালন ও বিপণনের কাজে শৈথিল্য দেখায়। বিদেশ থেকে কম দামে উচ্চ মানের পণ্য আমদানি করার সুযোগ না থাকাতে দেশের ক্রেতারা বাধ্য হয় বেশি খরচে নিকৃষ্টতর পণ্য ব্যবহার করতে। শ্রমজীবীদের কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা হলেও ক্রেতা হিসেবে তাদেরও ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। তবে যেসব দেশ শিল্পবিস্তারের ক্ষেত্রে প্রবেশার্থী মাত্র, তাদের পক্ষে বিনা সংরক্ষণে নতুন শিল্পোদ্যোগে ব্রতী হওয়া প্রায় অসম্ভব। কাজেই বাণিজ্যিক স্বাধীনতাকে কিছু পরিমাণে বলি দিতেই হয় শিল্পোন্নতির পথ বেয়ে চলতে চাইলে।

এখানে শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন প্রবেশার্থী দেশের সঙ্গে শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির স্বার্থের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিছু পরিমাণে রপ্তানির বাজার সংকুচিত হলেই শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে শিল্পের চাকা বন্ধ হয়ে যেতে থাকে, শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়ে আর তার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাদের পশ্চাদপসরণ ঘটতে থাকে। আন্তর্জাতিক স্তরে পণ্য বিনিময়কে বাধামুক্ত রাখতে গেলে শিল্পবিস্তারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের নীতির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। প্রতিযোগিতার বাতাবরণকে বজায় রেখেও সহযোগিতার বিভিন্ন পন্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করতে হয়।

২

এই ধরনের সহযোগিতার প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করেই 'গ্যাট' নামক সংগঠনটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কাজে নেমে পড়েছিল। তখন এর সদস্য দেশের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৩ এবং একমাত্র শুল্কবিধি ছাড়া অন্যান্য নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বা অন্য ধরনের বাণিজ্যগত বিরোধ নিয়ে একে উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি। ব্যাপকতর ক্রিয়াকলাপের কথা ভেবে একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দেই, কিন্তু বিভিন্ন দেশ তখন পর্যন্ত স্বাধীনভাবে নিজেদের বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের বিধান অনুসরণ করতে অভ্যস্ত ছিল বলে কোনো আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ তাদের অনেকের কাছেই গ্রহণীয় বলে মনে হয়নি। তখন শুধু এইটুকুই মেনে নেওয়া হয়েছিল যে শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্বার্থান্বেষী হয়ে উঠলে কোনও দেশই শেষ পর্যন্ত লাভবান হয় না, বরং বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াতে পারলে লাভের মাত্রা বেশি হবার আশা করা যায়। সেই কারণে অতিরিক্ত চড়া হারের শুল্ককে ধাপে ধাপে কমিয়ে আনার চেষ্টায় 'গ্যাট'-এর সদস্য দেশগুলি সম্মতি জানিয়েছিল। আন্তর্জাতিক এই প্রচেষ্টার রূপায়ণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হল 'শুল্ক ও বাণিজ্যের সাধারণ মতৈক্য' (General Agreement on Tariffs and Trade), যাকে ইংরেজি নামের আদ্যক্ষরগুলি ধরে সংক্ষেপে 'গ্যাট' নামে অভিহিত করা হল। লক্ষ করতে হবে যে এই প্রচেষ্টা (১) পারস্পরিক মতবিনিময় ও যৌথ সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে একে বাইরের হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করা হত না, এবং (২) দুটি দেশ পরস্পরের আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস করতে রাজি হলে সেই হ্রাসপ্রাপ্ত শুল্কই হত সব সদস্য দেশের জন্য প্রযোজ্য, অর্থাৎ দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়া হলেও তাকে একটি সর্বসম্মত চুক্তি বলে গণ্য করা হত। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ফলে কেবল চুক্তিকারী দুই পক্ষই লাভবান হয়। কিন্তু 'গ্যাট' চুক্তিকে সর্বজনীন করে তোলাই সর্বসম্মত রীতি। ফলে কোনও দেশই এমন অভিযোগ জানাতে পারত না যে শুল্কের ব্যাপারে তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে।

গ্যাট-এর কার্যপ্রণালীর মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার উপর গুরুত্ব থাকাতে সাধারণ কোনও নিয়মকানুন প্রবর্তন করার প্রয়োজন তখন দেখা দেয়নি। কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর সদস্য দেশগুলি মিলিত হয়ে স্থির করে নিত, তাদের শুল্কের বিভিন্ন হারকে কোন পণ্যের উপর কতটা তারা কমিয়ে দিতে পারবে। একবার শুল্কের হার কমাতে রাজি হলে ভবিষ্যতে আবার তাকে বাড়ানো হত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সামিল। কাজেই সাধারণভাবে সব সদস্য দেশেই আমদানির উপর শুল্ক কমে এসেছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত সাত দফা আলোচনার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর শুল্কের ভার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল এবং বিভিন্ন সদস্য দেশের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের মাত্রাও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল।

শুল্ক হ্রাস করার এই প্রচেষ্টার ফলে লাভবান হয়েছিল প্রধানত সেই সব দেশ যারা শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। আবার শিল্পজাত পণ্যের মধ্যেও যে সব পণ্য উচ্চ মানের প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে তাদের ক্ষেত্রেই বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু

যে-সব দেশ শিল্পে পশ্চাৎপদ, অথবা রপ্তানির উপযোগী শিল্পজাত পণ্যের সম্ভার যাদের কম, তারা 'গ্যাট'-এর সদস্য থেকেও খুব উপকার লাভ করেনি। তবে সেই সময়ে পশ্চাৎপদ দেশগুলি একটি বিশেষ সুবিধা আদায় করে নিতে পেরেছিল। তারা নিজেদের আমদানির উপর শুল্কহার না কমিয়েও অন্য দেশের হ্রাসপ্রাপ্ত শুল্কহারের সুফল ভোগ করতে পারত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সুবিধার সদ্ব্যবহার করে পশ্চাৎপদ দেশগুলিকেও বিশ্বের বাজারে তাদের শিল্পজাত পণ্য নিয়ে প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছে।

এর মধ্যেও আবার বস্ত্রশিল্প ছিল এক বিশেষ ব্যতিক্রম। বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত প্রযুক্তি অপেক্ষাকৃত সরল থাকার ফলে পশ্চাৎপদ দেশগুলিতেও এই শিল্প ক্রমবর্ধমান। এই সব দেশে মজুরির হার কম, তাই এরা উন্নত দেশের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বাজার দখল করে নিতে পারে। কিন্তু সমৃদ্ধ দেশগুলি এত সহজে তাদের বস্ত্রশিল্পকে গুটিয়ে রাজি ছিল না বলে তারা শুল্কের বদলে আমদানির 'কোটা' (quota) বেঁধে দিয়ে আমদানিকে কম করে রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল। 'কোটা'-ব্যবস্থার আরও একটি দিক ছিল যে এতে বিভিন্ন রপ্তানিকারী দেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ 'কোটা' নির্দিষ্ট করে কোনও কোনও মৈত্রীভাবাপন্ন দেশকে বিশেষ সুবিধা করে দেওয়া সম্ভব হত। এই বৈষম্যমূলক আচরণ আদর্শগতভাবে নিন্দনীয় হলেও বাস্তব রাজনৈতিক সম্পর্কে প্রেক্ষাপটে এর তাৎপর্য বোঝা কঠিন নয়। যাতে এই ধরনের বিভেদমূলক আচরণ বন্ধ করা যায়, যাতে সব দেশই শুল্ক দামের ভিত্তিতে সমান তালে খোলাখুলি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে, তার জন্য 'কোটা' প্রথার বিলোপ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু 'গ্যাট' এই সমস্যার সমাধানে বিশেষ কোনও আগ্রহ দেখায়নি। অন্য কোনও অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এই সমস্যার মূলে আঘাত করতে পারবে কিনা তা অবশ্যই অনিশ্চিত। তবু এই রকমের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের কাজেই 'গ্যাট'-এর অষ্টম পর্যায়ের আলোচনায় সদস্য দেশগুলি উরুগুয়ে রাষ্ট্রে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে জেনিভা শহরে ১৯৯৪-এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত দফায় দফায় বৈঠক করেছে। গুরুতর নানাবিধ মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আপাতত এই দেশগুলি একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার গঠনতন্ত্রে আস্থা জ্ঞাপন করেছে। ১৯৯৪-এর ১৫ই এপ্রিল মরক্কোর মারাকেশ শহরে গঠনতন্ত্রটিতে সম্মতি জানিয়েছে প্রায় ১১৫টি রাষ্ট্র।

নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা, যার কাজকর্মের পরিধি 'গ্যাট'-এর তুলনায় আরও অনেক ব্যাপক হবে, তার সূচনা হবে সব সদস্য দেশের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেলে। শুধু ভারতে নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে এই সংস্থার ক্ষমতা এতই বেশি হবে যে সদস্য দেশগুলির সার্বভৌমত্ব তার ফলে ক্ষুণ্ণ হবে, কোন দেশই নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করতে পারবে না। একথা অবশ্যই সত্য যে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থাটি যদি বাস্তবিকই আইন-মাফিক কাজ করতে পারে, তবে সদস্য দেশগুলি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে আর নিজেদের বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। সব দেশকে একই ধরনের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে, আর সেই সব নিয়ম মেনে চললে চড়া হারে শুল্ক বসানো, প্রতিযোগিতার চাপ এড়াতে অনুদান দিয়ে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা, আমদানির জন্য নির্দিষ্ট 'কোটা' স্থির করে দেওয়া প্রভৃতির সাহায্যে বাণিজ্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা চলবে না। বাণিজ্যে নিযুক্ত মানুষজনের স্বাধীনতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্যই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে কিছু পরিমাণে সংকুচিত করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছে। কেন না বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ বহু ধরনের অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও বৈরিতার জন্ম দিয়েছে।

তবে সার্বভৌমত্ব নিয়ে অযথা চিন্তাগ্রস্ত হবারও কোনও কারণ নেই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাধারণভাবে মানা নিয়মগুলি মেনে চলতে না চাইলে যে-কোনও দেশ আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিতে পারে, তার জন্য শুধু ছয় মাসের অপেক্ষাকাল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর বাণিজ্য করতে গিয়ে কোনও দেশ যদি ক্রমাগত দেনায় ডুবে যেতে থাকে, অর্থাৎ তার রপ্তানির উপার্জন যদি কোনমতেই আমদানির দায় মেটাতে না পারে, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা অন্তত কিছুকালের জন্য এই বিপন্ন দেশটিকে বাণিজ্যের উপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ জারি করার অনুমতি দিতে পারে। সংস্থার সদস্যপদ বহাল রাখতে চাইলে এই অনুমতি নেওয়াটা কিন্তু আবশ্যিক। সেই অর্থে একতরফা নিয়মকানুন প্রবর্তন করার অধিকারটি যে সংকুচিত হবে তা অস্বীকার করা যায় না।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 'গ্যাট'-এর অবলুপ্তি ঘটবে। এ যাবৎ 'গ্যাট' তার কাজকর্ম চালাচ্ছিল বিভিন্ন সদস্য দেশের আলোচনা ও মতৈক্যের মাধ্যমে। সেখানে ভোট নেওয়া ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে প্রাধান্য দেবার প্রশ্ন ছিল অবান্তর। নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থাটিতে কিন্তু ভোটের ব্যবস্থা থাকবে। কোনও কোনও নিয়ম পালটাতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ, এমন কি তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতারও প্রয়োজন হবে। এর ফলে গোড়াতেই যে-সব নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে সংস্থাটি গঠিত হতে যাচ্ছে, সেই সব নিয়মের সংশোধন ও পরিবর্তন বেশ দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। গোড়ার দিকের এই নিয়মগুলি স্থির করার ক্ষেত্রে 'গ্যাট'-এর প্রাক্তন প্রধান কর্মসচিব আর্থার ডুংকেল-এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থাটি যদি সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে, তবে ডুংকেল-এর চিন্তাপ্রণালী অবশ্যই বাহবা পাবে। আবার যদি দেখা যায় যে সংস্থাটি তার এক ঝুড়ি নিয়মের কড়াক ড়ি

নিয়ে নিজেই অচল হয়ে পড়ার অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে, তা হলে ডুংকেল-এর তৈরি নিয়মকানুনকে মনে হবে বাস্তবতাবর্জিত এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসফল।

ডুংকেল নতুন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছেন, বাণিজ্য সংস্থার কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করে আর এর নিয়মকানুনকে আগের তুলনায় অনেক বেশি ছিমছাম করতে চেয়ে। কাম্য পরিবর্তনগুলির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়াও তাঁর চিন্তাপ্রণালীর এক বৈশিষ্ট্য। অনন্যোপায় হয়ে সদস্য দেশগুলি ডুংকেল-এর প্রায় সব প্রস্তাবই আপাতত মেনে নিয়েছে। কিন্তু ধরে নেওয়া যায় না যে সব রকম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিরোধের অবসান ঘটাতে ডুংকেল এক অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছেন এবং বিভিন্ন দেশের উপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি পুরোপুরি সফল হবে। বিশেষ করে আর্থিক ক্ষমতায় বলীয়ান দেশগুলি এই সংস্থার পরোয়া করবে কিনা, দুর্বল দেশগুলি এই সংস্থাকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারবে কিনা, এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষায় থাকতে হবে।

একটি নিয়মবদ্ধ আন্তর্জাতিক সংগঠন নতুন করে স্থাপিত হল, এই লাভের বিষয়টিকে কিন্তু অস্বীকার করা উচিত নয়। আর এর কাজের দায়িত্ব শুধু দেশে দেশে দ্রব্য-বিনিময়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আন্তর্জাতিক আর্থিক সম্পর্কের আরও বহুবিধ ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব হবে বিস্তৃত। এক দেশের শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মপ্রার্থী অন্য দেশে অবাধে প্রবেশ করতে পারবে কিনা, এক দেশের শিল্পোদ্যোগী অন্য দেশে শিল্প স্থাপন করতে চাইলে বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হবে কিনা, এক দেশের বৈজ্ঞানিক ও কৃষি-বিষয়ক উদ্ভাবন অন্য দেশের শিল্পে ও কৃষিতে ব্যবহৃত হতে পারবে কিনা, এক দেশে প্রকাশিত গ্রন্থ অন্য দেশে পুনর্মুদ্রণ করা রোধ করা যাবে কিনা ইত্যাদি নানাবিধ জটিল সমস্যার জালে জড়িত হয়েই নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা ভূমিষ্ঠ হতে যাচ্ছে। এই জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে একটি উন্মুক্ত এবং অবিসংবাদিত আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজটি খুব নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হবে বলে ধরে নেওয়া যায় না।

যে-সব বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে নানা গুরুতর স্বার্থ-সংঘাত দেখা দিতে পারে তার কিছু পূর্বাভাস এখনই দিয়ে রাখা সম্ভব। প্রথমত, কোনও দেশই চাইবে না কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের জন্য পরনির্ভর হয়ে স্বদেশের কৃষিজীবীদের জীবিকাকে বিপন্ন করে তুলতে। অথচ মুক্ত বাণিজ্যের নীতিতে অবিচলিত থাকতে হলে কৃষিজ পণ্যের আমদানি-রপ্তানির উপর বর্তমানে যত কিছু নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তার অবসান ঘটানো দরকার। একটি দেশ সস্তায় শস্য উৎপাদন করে স্বভাবতই অন্য দেশের বাজারে প্রবেশ করবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, কিন্তু দ্বিতীয় দেশটি খাদ্যশস্য বা কাঁচামালের জন্য সম্পূর্ণ পরনির্ভর হওয়াকে স্বদেশদ্রোহিতার সমতুল্য বলে মনে করলে প্রথম দেশের অধিকারকে সে নানাভাবে খর্ব করতে চাইবে। কৃষিজ পণ্যের অবাধ বাণিজ্য নিয়ে এই ধরনের মতভেদ অবশ্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকে বারবার ক্ষুণ্ণ করতে চাইবে।

দ্বিতীয় মতপার্থক্যের বিষয় হবে বৈদেশিক বিনিয়োগ। বিদেশের সম্পদশালী বিনিয়োগকারীরা অসমান প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পোদ্যোগীদের পরাভূত করলে, তা অর্থবিভাগের বিচারে যতই 'যোগ্যতার বিজয়' বলে প্রশস্তি লাভ করুক না কেন, দেশের অভ্যন্তরে পরাস্ত সৈনিকদের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলার লোকের অভাব ঘটবে না। দেশের বাজারে একজন ব্যবসায়ী অন্য আরেক ব্যবসায়ীকে প্রতিযোগিতায় ধরাশায়ী করলে খবর হিসেবে তার তেমন গুরুত্ব নেই। কিন্তু অন্য দল থেকে একই ধরনের প্রতিযোগিতা প্রায় সর্বদাই অসংগত ও অন্যায্য বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রেও পূর্ণ আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা শক্ত হবে। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা দেশের সম্পদ ব্যবহার করে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করে দেশের অভ্যন্তরে বেকারত্ব ঘোচাতে সচেষ্ট হবেন এও এক ধরনের বৈদেশিক আগ্রাসন বলেই গণ্য হবে, কারণ শিল্পের মুনাফা যাবে বৈদেশিদের হাতে। অথচ দেশীয় শিল্পপতিরা যদি একই পরিমাণের মুনাফা অর্জন করেন তবে সেটা হবে তাদের যোগ্যতার পরিচায়ক। এই মনস্তাত্ত্বিকতাকে জাতীয়তাবোধের এক রকমফের বলেই ধরে নেওয়া যায়। আর যতদিন পর্যন্ত এই মনোভাব বজায় থাকে, ততদিন বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের উপর কম বেশি কিছু বাধানিষেধও আরোপ করা হবে। এই নিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার দরবারে বহু অভিযোগ ভবিষ্যতে জমা পড়বে বলে আশংকা করা যায়।

আরও একটি বিষয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থাকে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে যাকে ঘিরে ভবিষ্যতে তীব্র অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও কৃষিপ্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে যিনি উদ্ভাবক তিনি যে দেশের অধিবাসী হোন না কেন, তাঁর অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে এই বহুরাষ্ট্রীয় সংস্থাকে। এ সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম সকল সদস্য দেশকেই মেনে চলতে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে যে এই বাঁধাবাঁধির দরুন এক দেশে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির অন্য দেশে প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে কিনা। যেহেতু বৈজ্ঞানিক গবেষণা আজকাল প্রচুর ব্যয়সাধ্য সেইজন্য অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের উৎস হবে সমৃদ্ধ দেশের বৃহদাকার শিল্পসংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত গবেষণাগারগুলি। এই সব শিল্পসংস্থাকে যদি বহু বৎসর ধরে তাদের উদ্ভাবনগুলির উপর একচ্ছত্র অধিকার বজায় রাখতে দেওয়া হয়, তাহলে দরিদ্রতর দেশগুলি হয় উন্নত প্রযুক্তির সুফল থেকে বঞ্চিত থাকবে, নয়ত সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় বহন করে ঐ সব প্রযুক্তিকে নিজেদের ব্যবহারের

জন্য কিনে আনতে বাধ্য হবে। নতুন প্রজাতির কৃষিবীজ বা সদ্য আবিষ্কৃত জীবনদায়ী ঔষধের ক্ষেত্রে এই অবস্থা খুবই অসহনীয় হয়ে উঠবে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই একে নীতিবহির্ভূত বলে মনে করা হবে। অথচ আগে যেখানে ঔষধের পেটেন্ট ৭ থেকে ১০ বৎসরের জন্য বজায় রাখা যেত, এখন বজায় রাখা যাবে ২০ বৎসর। এতে হয়ত বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন আগের তুলনায় বেশি করে উৎসাহিত হবে, হয়তো আরও বেশি ব্যয়সাধ্য গবেষণায় নিরত থাকার সুযোগও পাওয়া যাবে, কিন্তু দরিদ্র দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের হাতে গবেষণার সুফল এসে পৌঁছতে বিলম্ব হবে আগের তুলনায় আরও অনেক বেশি। এই নিয়মের সংশোধন করা না হলে আশঙ্কা থেকে যায় যে অনেক দেশেই বিরূপ মনোভাব দানা বেঁধে উঠবে।

ভারতের পক্ষেও এ কথা খাটে যে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসেবে শিল্প ও কৃষিতে বিদেশি উদ্ভাবনের ব্যবহার এই ব্যবস্থার ফলে কিছু সংকটের মুখোমুখি হবে। তবু যে ভারত এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে তার মুখ্য কারণ হল, যদি ভবিষ্যতে কৃষিজ পণ্য ও যন্ত্র রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি পায় তবে ভারত তার সুবিধা কিছু পরিমাণে ভোগ করতে পারবে। এ ছাড়া বিদেশে অবাধ প্রবেশের সুযোগ বাড়লে ভারতে কর্মহীনতার সমস্যা খানিকটা মিটবে। লাভের তুলনায় ক্ষতির সম্ভাবনা কতটা তার হিসাবনিকাশ এই মুহূর্তে করে ফেলা সম্ভব নয়। মনে হয় ভারতের পক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ হওয়া উচিত অন্যান্য সমগোত্রীয় দেশের সঙ্গে একজোট হয়ে আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে নয়, শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার বর্তমান কয়েকটি অধিনিয়মের বিরুদ্ধে, প্রবল জনমত গড়ে তোলা। এ কাজে ধৈর্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারলে ফললাভের প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দেওয়া যায় না।

বাংলাদেশে চতুরঙ্গের পরিবেশক

পাঠক সমাবেশ

১৭/৩, আজিজ মার্কেট

শাহবাগ, ঢাকা

গল্প

গগন চটি

সন্তোষকুমার দে

ভদ্রলোক ভিজিটরস রুমে ঢুকে কোন দিক না তাকিয়ে আমার পাশের খালি চেয়ারটায় এসে বসলেন। মাথার চুলগুলি ধবধবে সাদা, চোখের কালো লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমায় চেহারায় এমন একটা গাম্ভীর্য ফুটেছে যে মনে হল বোধহয় কোন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক হবেন। কিন্তু যখন বেয়ারার হাতে তাঁর ভিজিটিং কার্ড দিলেন, এক নজরে সে কার্ডের কোণে একটি অতি পরিচিত আন্তর্জাতিক কোম্পানির প্রতীক চিহ্ন দেখতে পেয়ে বুঝলাম, তিনি ঐ খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের কোন উচ্চ পদাধিকারী ছিলেন। এত বয়সে নিশ্চয় অবসর নিয়েছেন, তবু অভ্যাসবশত আগেকার কার্ডই ব্যবহার করেন।

বেয়ারাকে বুঝিয়ে বললেন, তাঁর স্ত্রী এই কলেজে পড়েন। তাঁর নাম, ক্লাস, রোল নম্বর সব কার্ডের পিছনে লেখা আছে, তাঁকে শুধু একবার এখানে এসে দেখা করতে বলতে হবে, জরুরি দরকার আছে।

কথাটা শুনে আমার কৌতূহল হল, 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' নয়তো? আজকাল তো এমন বড় একটা শোনা যায় না। ইনি কি তবে বিগত দিনের ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন?

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাঁর বিচক্ষণ নজর এড়ালো না। তিনিই প্রথমে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আজকের খেলার খবর জানেন নাকি?"

আমার যদিও কাগজে নজর পড়েছিল, ইডেনে আজ কারা কারা দ্বৈরথ যুদ্ধে নামবেন, কিন্তু আগ্রহ না থাকায় রেডিওতে সে খেলার ধারাবিবরণ শুনিনি। তাই অকপটে স্বীকার করলাম, ক্রিকেটে আমার উৎসাহের অভাবের কথা। আমাদের কথা কিন্তু তাই বলে সেখানেই বন্ধ হল না এবং তখনই জানতে পারলাম, তিনি আদৌ কোনও বিয়ে-পাগলা বুড়ো নন। তাঁর বয়স পঁচাত্তর, তাঁর স্ত্রীর সত্তর। ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে বে-থা করে যে যার ঘর-সংসার করছে। বুড়ো-বুড়ীর হাত-পা ঝাড়া। বুড়োর তবু বই পড়া, খেলা দেখা, প্রাতর্ভ্রমণ ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প গুজব— এই রকম নানা বিষয়ে আকর্ষণ আছে। কিন্তু বুড়ীর দিন কাটে না। অথচ, একসময় স্কুল-কলেজে ভালো ছাত্রী ছিলেন, ফার্স্ট ডিভিসনে আই-এ পাশও করেছিলেন। তারপরেই বিয়ে হয় এবং স্বামীর ঘরে এসে আর কলেজে যাওয়ার সুযোগ ঘটেনি। এখন শেষ বয়সে আবার কলেজে ভর্তি হয়েছেন — ডিগ্রীর লোভে নয়, নিছক সময় কাটাতে।

সত্তর বছর বয়সের ছাত্রীকে দেখবার সৌভাগ্য হবে প্রত্যাশায় আমিও সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি গিয়েছিলাম আমার মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, সে কথা শুনে তিনি বললেন, তাঁর মেয়েও এই কলেজের ছাত্রী ছিল। এখন বিয়ে হয়ে বম্বে থাকে।

কথায় কথায় তিনি বললেন, তাঁর বড় ছেলে বিদেশে সেটেল করেছে। সেখানে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী ঘুরেও এসেছেন। ছোট ছেলেটিও বিদেশে পড়তে গিয়ে সেখানেই অধ্যাপনা করত। কিছুকাল আগে এখানে বোস ইনস্টিটিউটের আহ্বানে এসেছে। সঙ্গে এনেছে তার বিদেশী বৌ আর একটি ফুটফুটে বাচ্চা। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। গিন্নী তাকে বাংলা বলতে শিখিয়েছেন, তা শুনতে আরও মজা। কিন্তু তার মায়ের বোধহয় ব্যাপারটা পছন্দ নয়। আর তাছাড়া শ্যামবাজারে বাঙালি পাড়ার গৃহস্থ বাড়ির আবহাওয়ায় মনে হয় বিদেশিনী হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। মুখে কিছু বলতেন না। কিন্তু ক্রমে সেটা টের পাওয়া গেল। ছোট ছেলে সায়েব পাড়ায় এক বিরাট বাড়ির ত্রিশ তলায় একটা ফ্ল্যাট কিনে সেখানে উঠে গেল। তাতে আবার তার নিজের মায়ের মনে লাগল। কতকাল পরে বিদেশ থেকে ছেলে ফিরল, বাড়ি ঘর আনন্দে ভরে উঠল। তিনিও বেশ মনের আনন্দেই ছিলেন। দুরন্ত বাচ্চাটি সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াত, তারা চলে গেলে আবার বাড়ি নিস্তব্ধ। পাশাপাশি ঐ ভদ্রলোকের ভাইয়ের সংসার থাকলেও নিজের ঘরের মধ্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আবার একা হয়ে পড়েছিলেন। অভিমানিনী মা ছেলের সায়েব পাড়ার ফ্ল্যাট একদিন দেখতেও গেলেন না।

ছেলে কিন্তু শোনেনি, বাবাকে যত্ন করে নিয়ে গেছে, ফ্ল্যাটের সেরা ঘরখানি সুন্দর করে সাজিয়ে তার বাবাকে সেখানে রেখেছে। ভেবেছিলেন তিনি এক রাত কাটিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরবেন, কিন্তু বাদ সাধলো তার মোমের পুতুলের মতো নাতিটি। সে তার দাদুকে পেয়ে মহা উল্লসিত, সে কিছুতেই তাঁর কাছ ছাড়া হতে চায় না।

আর যে বৌ শ্যামবাজারের বাড়িতে পাশাপাশি দুই সংসারের ছায়ায় মিইয়ে পড়েছিল, এখানে সে একাই সারা ফ্ল্যাট সাজিয়ে গুছিয়ে ফিটফাট করে রেখেছে। শ্যামবাজারের বাড়িতে উঠোন আছে, শিউলি গাছ আছে, তুলসীতলা আছে — সে সব সেই বিদেশিনী কোন দিন ফিরেও দেখেনি। এখানে ত্রিশ তলার উপরে তার কত রকম সৌখিন গাছের টব। গাছ-ফুল-লতাপাতা সব

কিছুতেই যে তার সমান যত্ন, তা দেখেও চোখ জুড়ায়। মনে হয় যেন মা দুর্গার মতো তারও দশখানি হাত। স্বামী পণ্ডিত মানুষ, বৈজ্ঞানিক, তাঁর মর্যাদা সম্পর্কেও সে সমান সচেতন। এ দেশের দশজন বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁর স্বামীর কাছে আসেন তাতেও সে সমান আগ্রহী। বিদেশিনী মেয়েটিকে তার নিজ পরিবেশে দেখে ভদ্রলোকের যে খুবই ভালো লেগেছে, সে কথা তিনি সোৎসাহে শোনাতে লাগলেন আমাকে।

দেশলাই বাক্সের মতো বাড়িগুলি সম্পর্কেও দেখলাম তাঁর মনোভাব বেশ শ্রদ্ধান্বিত। বললেন — মনে হয় যেন জাহাজের কেবিনে বসে মেঘের সমুদ্রে ভেসে চলেছি। আবার মনে হয় বাড়িটাই যেন একটি বৃহৎ যন্ত্র। তার লিফ্‌ট্ সিঁড়ি ভাঙতে দেয় না। তার গীজার শীতের দিনে গরম জল যোগায়। তার এয়ারকন্ডিশনার গরমের দিনে দার্জিলিং-এর আবহাওয়া আনে। পাশাপাশি কত পরিবার একই সঙ্গে থাকে, কিন্তু কারো সঙ্গে কারো ঘেসাঘেসি নেই। বাড়ির সুমুখের বাগানটিও কম মনোলোভা নয়, কিন্তু তার জন্য নিজের কোনও পরিশ্রমের ঝামেলা নেই। এস্টেটের ম্যানেজার থেকে মালি — সবাই সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রার এমন উপনিবেশ দেখলে গিন্নী নিশ্চয়ই খুশী হবেন, তাই তাঁকে কলেজ থেকে ধরে ছেলের ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবেন বলেই তিনি এখানে এসেছেন।

এক মনে সেই ভদ্রলোকের কথা শুনছিলাম, এমন সময় সেখানে একজন মাঝবয়সী মহিলা আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন — এই কার্ড কে পাঠিয়েছেন?

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন — আমি পাঠিয়েছি।

তাঁকে দেখা মাত্র মহিলাটি তাঁর কাছে গিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন, মেসোমশাই, আপনি কেমন আছেন? এখানে কি জন্য এসেছেন?

ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বললেন — মা, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। আমি এসেছি আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি এই কলেজে পড়েন।

মহিলাটি বললেন — আমায় চিনতে পারলেন না? আমি আপনার মেয়ে বিনুর বন্ধু ছিলাম। আমার নাম মিনু — মিনতি মিত্র, বিয়ে হয়ে মুখার্জি হয়েছি, আমি এখন এই কলেজে পড়াই। ছোটবেলায় আপনাদের বাড়ি কত গিয়েছি বিনুর কাছে। মাসিমা আমায় কত ভালবাসতেন। আপনি তো শুনেছি ছোড়দা-ছোটবৌদির কাছে তাঁদের ফ্ল্যাটে থাকেন। সেটা কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন — পার্ক স্ট্রিটে, বাড়ির নাম আমি দিয়েছি "গগন চটি"। চটি মানে পায়ে পড়ার চটি নয়, পাহাড়ের উপরে কেদারবদরি গিয়েছিলাম, তার পথে পথে পরিব্রাজকদের রাত কাটাবার ডেরা আছে, তাকেও বলে "চটি"। এখনকার ঐ উঁচু উঁচু বাড়িগুলিও বাবু-বিবিদের রাত কাটাবার ডেরা। সারা দিন তো সবাই কেবল ছুটাছুটিই করে। হরদম লিফ্‌ট্ উঠছে-নাবছে, টিংটিং করে ঘণ্টা পড়ছে। বিশ্রাম বলে কিছু নেই। তা মা, তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

— হিদারাম ব্যানার্জি লেন, বৌবাজার। এখন সে রাস্তা দেখলেও আপনি চিনতে পারবেন না। সেখানেও অনেক ফ্ল্যাট বাড়ি। আমরা অবশ্য একটা ছোট্ট বাড়ির এগারো তলায় থাকি। তবে বাড়িটির নামটি ভালো — 'সিয়ার্স', মানে দর্শকগণ। ইংরেজিতে 'Seers' লেখা আছে বাড়ির গায়ে।

—'Seers' নামে শুনেছি শিকাগো শহরে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে উঁচু এক পেল্লায় বাড়ি আছে — তোমাদের বাড়ির নাম শুনে লোকে সেই বাড়ির কথাই ভাববে। তা ভালো। এখন সবাই বেশ স্বপ্নের দেশে মেঘলোকবাসী হয়েছ। লিফ্‌টে উঠলে ব্লাড প্রেসার বাড়ে। তিনি কিন্তু এসব বাড়ির সুবিধেগুলি বিচার করেন না। তাই তো তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। গিয়ে দেখলে নিশ্চয় তাঁরও ভালো লাগবে। আমিও ভালো লাগার চেষ্টা করছি — কেবল মাটি কামড়ে পড়ে থেকে কি হবে, একটু আকাশে উঠেই দেখি না, কেমন লাগে! বোয়িং বিমানে চেপে সমুদ্র ডিঙিয়েছি আর এখন বোয়িং বাড়িতে বাস করে একেবারে সশরীরে স্বর্গবাস। স্বয়ং কালিদাস তাঁর শকুন্তলা কাব্যে বলে গেছেন না?—

'রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখীতোহপি জন্তু'—

আমার এখন সেই "পর্যুৎসুকী" ভাব। আমার ভালোলাগা বাড়ি তোমার মাসিমাকেও দেখাবো বলে, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব বলেই তো কলেজে এসেছি।

কিন্তু মেসোমশাই, আপনি এত জানেন আর ঘরের খবর ভুলে গেছেন? আপনি কি একা এসেছেন মাসিমাকে নিতে, না সঙ্গে গাড়ি নিয়ে ছোড়দাও এসেছেন?

ছোড়দাকে এখন কোথায় পাব? সে তো এখন বোস ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরিতে। হয়তো বারাসাতের কোনও বাগানে গাছাপালা নিয়ে রিসার্চ করছে। তোমার মাসিমার ভারি পড়াশুনার শখ ছিল তো, তাই তাঁকে আমিই কলেজে ভর্তি করিয়েছি। তাঁকে একটু ডেকে আনো।

মহিলাটি ভদ্রলোকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আর একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে বললেন — মেসোমশাই, আপনি দেখছি সব কিছুই ভুলে গেছেন। মাসিমা যে দশ বছর আগে চলে গেছেন, তিরিশ তলায় বাস করে সে কথাও আপনার মন থেকে মুছে গেছে? আপনি কল্পনারাজ্যে বাস করছেন। আপনাকে একা ছাড়া নিরাপদ মনে হচ্ছে না। আমি আপনাকে সঙ্গে করে আপনাদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে আসব। আমি ক্লাসে ছুটি দিয়ে এখুনি আসছি। আপনি একটু বসুন!

মহিলাটি ভিতরে চলে গেলেন, আর ভদ্রলোক ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

নয়নাংশু

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

নয়নাংশু বিশ্বাসের সঙ্গে ভাল করে আলাপ হবার পর নামের সঙ্গে ওর পেশাকে মেলাতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল। অবশ্য একজন পুলিশ অফিসারের নাম নয়নাংশু হতেই পারে, এর মধ্যে কোনও গণ্ডগোল নেই। কিন্তু নয়নাংশু নামটার মধ্যে এমন এক কাব্যিক স্নিগ্ধতা লুকিয়ে আছে যে সেটা একজন পুলিশ অফিসারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে মন চায় না। সঙ্গত কারণেই। যদিও প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে তার কাজের মিল থাকবে, এমন কোনও কথা নেই, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উলটোটাই দেখা যায়। যেমন, আমার বিশেষ বন্ধু গুঞ্জন কোন এক কারখানায় ফোরম্যানের কাজ করে আর বৃন্দাবনকাকু রেল অফিসের কেরানি।

আমি প্রথমেই 'ভাল করে আলাপ হবার পর' কথাটা ব্যবহার করেছি মানে বলতে চেয়েছি নয়নাংশুর সঙ্গে এমনি আমার একবার আলাপ হয়েছিল। (সেটার পেছনে অবশ্য এক দুর্দান্ত ঘটনা লুকিয়ে আছে।) কিন্তু তারপর আমাদের বহুদিন অবধি দেখাসাক্ষাৎ হয় না। প্রায় বছর সাতেক বাদে নতুন করে দেখা এবং 'ভাল করে আলাপ' হয়। আগে আমাদের প্রথম আলাপের গল্পটা বলি।

সালটা ঠিক মনে নেই। আটষট্টি উনসত্তর হবে। কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়া থমথম করছে। যখন তখন কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। এরকমই কোনও এক দুপুরে রাজভবনের সামনে দিয়ে আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটছি। যাব অফিসপাড়ায় এক পরিচিত ভদ্রলোকের কাছে চাকরির খোঁজে। রাজভবনের সদর দরজা ছাড়িয়ে কয়েক পা এগোতেই আটকে গেলুম। ব্যারিকেড করে পুলিশ রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। একটু পরে ওখান দিয়ে নাকি এক বিশাল ছাত্রমিছিল যাবার কথা। পুলিশ এগোতে দেবে না ওদের। অর্থাৎ রীতিমতো একটা গণ্ডগোল পাকানোর আশঙ্কা। ব্যারিকেড পেরিয়ে সাধারণ পথচারীরও ওপাশে যাবার কোনও উপায় নেই। আমি কী করব বুঝতে না-পেরে ফুটপাতের একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লুম। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করাটা ভীষণ জরুরি। আর তা'ছাড়া অন্য কোথায়ই বা যাব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাতপাঁচ ভাবছি। হঠাৎ দেখি দূরে একটা জটলা। একদল সাহেব ফিল্ম তোলার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদেরই মধ্যে একজন টি-শার্ট গায়ে একমাথা ঝাঁকড়া চুল, সুন্দর মুখ — অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাহেব মেমদের অসহায়ভাবে চলাফেরা করতে দেখলে আমার আবার সবদিনই একটু মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয়, আহা, এরকম সুন্দর শহরটার বুকে এরা এমনভাবে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াবে। এ যে আমাদেরই অপমান। লোকজন অবশ্য আমাকে এর জন্য "দাস-মনোভাবাপন্ন" বলে থাকে। আমার কিছু আসে যায় না। যাই হোক, সাহেবকে ওরকম এদিক-ওদিক চাইতে দেখে বুঝলুম ওর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। ঠিক লোক খুঁজে পাচ্ছে না। মনে মনে যথাসম্ভব ইংরেজিতে একটা নাতিদীর্ঘ কথোপকথন গুছিয়ে নিয়ে (যেন ধরেই নিয়েছি সাদা চামড়া মানেই ইংরেজ) এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "আপনাকে কি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি?"

ভীষণ গদগদ হয়ে সাহেব বলল, "আমি একজন ফিল্ম ডিরেকটর। এই শহরের রূপ দেখতে এসেছি। শুনেছি এখানে এখন ছাত্র-আন্দোলন চলছে। আমি তার আসল চেহারা দেখতে চাই।"

আমি বললুম, "শুনেছেন ঠিকই। কিন্তু একটু পরে এখানে যে মিছিলটা এসে পৌঁছবে, আর তারপর যে কাণ্ডটা শুরু হবে তার চেহারা দেখা খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা হবে না। সুতরাং, সময় থাকতে থাকতে এখান থেকে সরে পড়ুন।"

সাহেব হেসে বলল, "না, আমি দেখতে চাই।"

আমি বললুম, "আপনি চাইলেই তো হবে না। একজন বিদেশি এখানকার ছাত্র-পুলিশের সংঘর্ষের ছবি তুলছে দেখলে পুলিশ আপনাকে বাধা দেবে। ওই দেখুন একজন অফিসার কেমনভাবে তাকিয়ে আছে আপনাদের দিকে।"

সাহেব বলল, "আমি ওর কাছে গিয়ে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি।"

আমাকে চমকে দিয়ে সাহেব তক্ষুনি পা বাড়াল একটু দূরে জিপের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ অফিসারটির দিকে। আমি আর থাকতে পারলুম না। এতক্ষণ ধরে সাহেবের সঙ্গে ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে যে আলাপ চালাচ্ছিলুম (সাহেবও ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলছে দেখে আরও উৎসাহী হয়ে পড়েছিলুম), তার মজাটা পুরোপুরি উবে গেল সাহেবের গোঁয়ার্তুমি দেখে। নাঃ, লোকটা একটা ঝামেলা না বাধিয়েই ছাড়বে না। আমিও ছুটলুম সাহেবের পেছন পেছন।

সাহেব সোজা গিয়ে তরুণ পুলিশ অফিসারটিকে বলল, "আমি

সুদূর ফ্রান্স থেকে আসছি। আমি একজন ফিল্‌ম মেকার। আমি আপনাদের এখানকার ছাত্র-আন্দোলনের ছবি তুলতে চাই। আমার নাম লুই মাল।"

বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার লুই মাল। আমি এতক্ষণ এঁরই সঙ্গে বক্‌বক্ করছিলাম। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

কিন্তু আমার অবাক হওয়ার বাকি ছিল আর একটু। আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না-কাটতেই দেখি সেই তরুণ পুলিশ অফিসারটিও সাহেবের হাত চেপে ধরেছে। "কি সৌভাগ্য আমার! আপনার মতো একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারছি। জানেন,আমি আপনার ছবির বিশেষ অনুরাগী। আপনার অনেক ছবিই আমি দেখেছি। 'আ ভেরি প্রাইভেট অ্যাফেয়ার' ছবিটা দেখেছি তিনবার।"

আমি তো থ। লোকটা বলে কী! একটা কাটখোট্টা পুলিশ অফিসার — সে কিনা লুই মাল-এর ছবির অনুরাগী। লুই মাল-এর সঙ্গে আলাপ হয়ে যতটা না অবাক হয়েছিলুম তার চেয়ে ঢের বেশি অবাক হলুম অফিসারটিকে দেখে। এরকমও পুলিশ আছে এ-শহরে।

এরপর প্রায় টানা কুড়ি মিনিট লুই মাল-এর সঙ্গে সে বকে গেল সিনেমা এবং আধুনিক ফরাসি কবিতা নিয়ে। শুনলুম পোল এলুয়ার-এর কবিতা তার ভীষণ প্রিয়। শিক্ষিত বেকার হবার ফলে আমার সামান্য সাহিত্যচর্চা এবং দু'একটা সিনে ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অবসর এবং সৌভাগ্য ঘটেছিল। সেই সুবাদে এটুকু অন্তত বুঝে নিতে কোনও অসুবিধে হল না যে ইউনিফর্ম-পরা, কোমরে রিভলভার গোঁজা লোকটা যেসব কথা বলে চলেছে তা একেবারে ফালতু নয়, এবং স্বয়ং লুই মাল-ও অবাক চোখে ওর কথাবার্তা শুনছিলেন।

একসময় লুই মাল বললেন, "কিন্তু আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যে মানুষ আধুনিকতম ফরাসি সিনেমার সঙ্গে পরিচিত, পোল এলুয়ার-এর কবিতার এমন ভক্ত, সে কিনা আর কিছুক্ষণ বাদে লাঠি হাতে ছাত্রদের পেটাবে।"

সামান্য হেসে অফিসারটি বলল, "এটাই জীবন, নয় কি?"

অবশ্য বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও লুই মাল সেদিন ছবি তোলার সুযোগ পেলেন না। তবে, পুলিশের প্রাচীরের নিরাপদ আড়ালে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনাটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখার সুযোগ পেলেন। এবং সেইসঙ্গে আমিও।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। কোনও কাজের মানুষের পক্ষে সাত বছর হয়তো তেমন লম্বা কোনও সময় নয়, কিন্তু আমার মতো একজন নির্ভেজাল বেকারের পক্ষে সাত সাতটা বছর প্রায় একযুগ, কিংবা তারও বেশি কিছুর পর্যায়ে পৌঁছয়। এই এত বছরে আমার দৈনিক জীবনে ছোটখাটো কয়েকটা পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন ঠিক সাড়ে চারবছর আগে আমার ওপর বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে মিনতি এক ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করে নিয়েছে। আমার ছোটবেলার দুই বন্ধু বাবলা আর রমেন — দু'জনকেই কুকুরের মতো গুলি করে মেরেছে পুলিশ। সুতরাং আমাদের পুরনো বৈঠকও এখন উধাও। আমি দিনের বেলা এক প্রকাশকের দোকানে বসে যৎসামান্য মজুরির বিনিময়ে প্রুফ দেখি আর কখনও সখনও ক্যানভাসারের কাজ করি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হতেই হাঁটি হাঁটি পা পা করে ঢুকে পড়ি খালাসিটোলায়। বেরোই ঝাঁপ বন্ধ হবার ঠিক আগে। মা মারা যাবার পর আর একটু বদলেছে ছবিটা। একতলার ঘুপচি ঘরটা আমার জন্যে বরাদ্দ করে দিয়েছে আমার দুই দাদা মিলে। আগে রাত্তিরে বাড়ি ফিরে দেখতুম খাবার চাপা দেওয়া রয়েছে আমার জন্যে। এখন কোনও কোনও দিন তাও থাকে না।

এক বিকেলে যথারীতি হাজির হয়েছি খালাসিটোলায়। আমার পছন্দসই টেবিলটা সেদিন ভর্তি ছিল বলে আমাকে গিয়ে বসতে হল একদম কোণের এক টেবিলে। দেখি এক ভদ্রলোক চুপচাপ গেলাসের দিকে তাকিয়ে বসে বসে সিগারেট টানছেন। যদিও এই জায়গাটা ঠিক ভদ্রলোকের আসার মতো নয়, কিন্তু চারপাশের পরিবেশের মধ্যে এরকম ফিটফাট চেহারার একটি মানুষকে দেখলে শত চেষ্টাতেও তার থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়া যায় না। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করতে করতে এটুকু বুঝতে পারলুম তাকে যেন কোথায় দেখেছি। প্রথম প্রথম কিছুতেই মনে আনতে পারছিলুম না। হঠাৎ পুরনো ছবিগুলো পরপর ভেসে উঠতেই সেদিনের সেই তরুণ বুদ্ধিজীবী অফিসারটিকে আবিষ্কার করলুম।

গলা নামিয়ে বললুম, "আপনি কি এখনও পোল এলুয়ার পড়েন?"

চমকে উঠে ভদ্রলোক তাকালেন আমার দিকে এবং তাকিয়েই চিনতে পারলেন। হাসলেন সামান্য। "নাঃ।" জড়ানো গলায় স্বর শুনে বুঝলুম অনেকক্ষণ বসে আছেন এখানে। আমি ওর দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলুম। ভদ্রলোক বললেন, "আপনিও তাহলে এখানে?"

একগাল হেসে উত্তর দিলুম, "এটাই জীবন, নয় কি?"

ওরই একসময় বলা কথাটার যে পুনরুক্তি করলুম সেটা ভদ্রলোক লক্ষ করলেন না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এতদিন বাদে আবার দেখা হল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত নাম জানি না। চুপচাপ বসে বসে গেলাসে চুমুক দিতে লাগলুম।

"তো কেমন লাগছে এই জীবন — আশানুরূপ নাকি আশাতীত?" একটু পরে হঠাৎ উনি প্রশ্ন করলেন। দেওয়ালে

ঠেস দিয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন ঘোলাটে চোখে, আর মুখভঙ্গি এমন, ঠিক বলে বোঝানো যায় না — যেন আপাতভাবে আমার, আসলে নিজেরই প্রতি বিস্ময় এবং ব্যঙ্গ লুকিয়ে আছে।

আমি বুঝতে পারলুম না এই প্রশ্নের ঠিক কোন্ উত্তর দেওয়া যায়। চুপ করেই রইলুম। কেউ কোনও প্রশ্ন করার পর উত্তর দিতে না পারলে, সেই নীরবতা, যেরকম অসহ্য মনে হয়, আমার ওই চুপ করে বসে থাকার সময়টুকুও সেরকমভাবে অসহ্য ঠেকছিল। চারপাশের হই-হট্টগোলও সেই নিঃস্তব্ধতার চাপ ভাঙতে পারছিল না।

"জানেন, ছোটবেলায় আমাদের গ্রামে দাশকাকাদের একবার জোড়া চিতলমাছ ধরতে দেখেছিলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, এক-একটা মাছ এই অ্যাত্তো বড় বড়। দাশকাকা আর ওই দুই ছেলে বাঁশের চাটাইয়ে করে মাছদুটো বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনজন জোয়ান লোক মিলেও হিমসিম কাণ্ড। আমাদের সবাইকে খাইয়েছিলেন সেই মাছ। সর্ষে দিয়ে চিতল মাছের পেটির ঝাল— আঃ! তেমনটা আর খেলাম না কোনওদিন।"

আপন মনে বলে যেতে লাগলেন ভদ্রলোক। এটা আরও অস্বস্তিকর। আমি চুপচাপ বসে আছি, আর একজন কথা চালিয়ে যাচ্ছে। একবার মনে হল উঠে পড়ি। কিন্তু এভাবে কারও কথার মাঝখানে উঠে পড়া যায়? বসে বসে ভদ্রলোককে দেখতে লাগলুম। দোহারা চেহারা। যদ্দুর মনে পড়ছে আগে ফর্সা দেখেছি, এখন তামাটে। ভাঙা গাল সমেত লম্বাটে মুখ। মাত্র সাতবছরে চুল পেকে গেছে অনেক। নিয়মিত মদ্যপানে যেমন ফোলাফোলা চোখ থাকে, সেরকমই ফোলা খয়েরি চোখ। খোঁচাখোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। বুকের দুটো বোতাম খোলা। পকেট থেকে শস্তার সিগারেট বের করে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

"বেশ মনে আছে, একদিন বিকেল বেলা মেঘ করেছে খুব। আমি আর মা তখন মামাবাড়িতে। ভাই সবে হয়েছে তখন। মা সেদিন ভাইকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে এদিক সেদিক। দিদিমা আমাকে ডেকে বললেন, 'যা তো বাবা, মা'কে শীগগির ডেকে আন্। এক্ষুণি বৃষ্টি নামবে। কোথায় মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েটা।' বিরাট কাজের দায়িত্ব পেয়ে একছুটে আমি বেরিয়ে গেলুম। মাথার ওপর কালো হয়ে এসেছে আকাশ। আমি ছুটছি, ছুটছি। দূরে রেললাইনের ধারে দেখি ভাইকে নিয়ে মা দাঁড়িয়ে। 'মা, মা' ডাকতে ডাকতে আমি ছুটে চললুম। একটা ঢালু জমি পেরিয়ে আবার ছুটতে যাবো, অমনি ফোঁস। পায়ের কাছে অ্যাত্তোবড় ফণা তুলে একটা — কেউটে না গোখরো, কে জানে। এক লাফে পেরিয়ে গেলুম — ওই ছুটন্ত অবস্থাতেই। হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে মার বুকে মুখ গুঁজলুম। মার হাত ধরে টান দিয়ে বললুম, 'চলো, চলো, বৃষ্টি নামবে।' মা হেসে বলল, 'তুমি সেইজন্যে ছুটতে ছুটতে এসেছ?' ফেরার সময় আমি মাকে একটু ঘুরপথে নিয়ে গেলুম। তা না হলে যদি আবার তার সঙ্গে দেখা হয়? আচ্ছা, অমন কালো মেঘ কি আজও জমে আকাশে?"

আবার চুপচাপ। দু'জনেই বসে বসে গেলাসে চুমুক দিচ্ছি। এসব কথা হঠাৎ উনি আমাকে বলছেন কেন? নেশার ঘোরে স্মৃতি রোমন্থন? ছোঃ, ওসব কেউ করে নাকি আবার! স্মৃতি-ফৃতি স্রেফ বাজে কথা — ওসব কিস্যু নেই। যেসব মাতালের চাট কেনার পয়সা থাকে না, তারা ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে পুরনো দিনের ঝুলি নাড়ে। কিন্তু — কিন্তু আমার সামনে বসা লোকটার তো চাট কেনার পয়সা আছে নিশ্চয়ই। তার ওপর একজন পুলিশ অফিসারের (ধরে নিচ্ছি উনি এখনও তাই আছেন) চতুর্থ শ্রেণীর একটা পানশালায় এভাবে বসে থাকার কী কারণ ঘটতে পারে? কোনও কিছুরই মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলুম না। সন্ধ্যেটা যে আজ মাটি হতে চলেছে তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরে ব্যাজার হয়ে বসে রইলুম।

"আচ্ছা, স্বপ্নভঙ্গ বলতে কী বোঝায় আপনার জানা আছে?" হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, চাপা এবং অসহিষ্ণু গলায়।

নিজে মাতাল হয়েও এই সত্যটা আমি বিলক্ষণ জানি যে মদ খেতে খেতে দার্শনিক কচকচি যে কোনও সুস্থ মানুষকে বিনা অস্ত্রে, এতটুকু না-ছুঁয়ে মেরে ফেলার শ্রেষ্ঠতম উপায়। ওর প্রশ্নের উত্তর না-দেবার অক্ষমতা করুণ মুখে জানাতে যাব, ভদ্রলোক বললেন, "না, না, আমি এইসব টুকিটাকি নিত্যনৈমিত্তিক হতাশা-টতাশার কথা বলছি না। আমি বলতে চাইছি সেই বিরাট, প্রচণ্ড শক্তিশালী ব্যাপারটার কথা, যা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। আমরা যাকে ডিজইল্যুশনমেন্ট বলি — সেই বস্তুটির কথাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। বলি, এ-ব্যাপারে কি আপনি আমাকে কোনও আলোকপাত করতে পারেন?"

আমার মুখের দিকে একঝলক তাকিয়ে উনি আবার বলতে শুরু করলেন, "জানতাম আপনি পারবেন না। অবশ্য আপনাকে আমি কোনও দোষ দিচ্ছি না। বেশির ভাগ মানুষেরই সমস্যা এক। তারা ব্যাপারটা জানে, কিন্তু ঠিক বোঝাতে পারে না। আমি কিন্তু ছোটবেলার থেকেই এ-সম্পর্কে ভীষণভাবে সচেতন। আর সবচেয়ে মজাটা কী জানেন, আজও এই স্বপ্নভঙ্গের রোগ আমাকে ছাড়েনি। আমার জীবনের সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে।

"আমাদের বংশে কোনও স্থায়ী পেশা নেই। শুনেছি আমার দাদুর বাবা ছিলেন অবস্থাপন্ন কৃষক। আমার দাদু গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার। বাবা জেলা কোর্টে উকিল আর কাকাদের পানের ব্যবসা। আর আমি পুলিশ অফিসার, ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং, না? গ্রামের মধ্যে একমাত্র আমাদেরই পাকা বাড়ি ছিল।

পড়াশুনোর চল ছিল মোটামুটি। দাদুর ঘরে বড় বড় দু'আলমারি ঠাসা বই দেখেছি। একমাত্র আমারই সেখানে হাত দেওয়ার অধিকার ছিল। বাড়িতে সবসময় ভাল-মন্দ, ঠিক-ভুল, সুন্দর-কুৎসিত নিয়ে লম্বা-চওড়া বিধি-বিধান অলিখিতভাবে ঘোষিত ছিল দাদু আর বাবার ঠেলায়। ব্যাপারটা তখন থেকেই আমার বিশ্রী লাগত। কিন্তু কী করব, আমাকে তো ওরই মধ্যে থাকতে হয়েছে। একটা সময় অবধি এসব ভয়ানক কু-প্রভাব ফেলে এসেছে আমার ওপর। আমার চিন্তা-ভাবনা কেবল তাদের ছক ধরেই চলত। আমার নিজের বোধবুদ্ধি বলতে কিছুই ছিল না। যেমন, যে কোনও লোককে দেখলেই আমি ধরে নিতুম, হয় সে এক বিশুদ্ধ পুণ্যাত্মা, নয় আদ্যন্ত শয়তান। মাঝামাঝি কিছু না। এবং জীবন জিনিসটা হয় দম আটকানো সুন্দর নয় বীভৎস কদর্যতায় ভরা। কিন্তু সেইসঙ্গে এরকম একটা ধারণাও ভেতরে ভেতরে কাজ করত যে পৃথিবীটা হয়তো ঠিক এরকম নয়, আরও বড়, অন্যরকম কিছু। আমি অপেক্ষা করে থাকতুম সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা অভিজ্ঞতার জন্যে। ভাল কি খারাপ, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা ছিল না। আমি চাইতাম অন্তত এমন কিছু একটা হোক, যা আমার জীবনকে কিছুটা উলটে-পালটে দিয়ে যায়।"

ভদ্রলোক একটা বড় চুমুকে গেলাস খালি করে আর এক বোতলের অর্ডার দিলেন। তাঁর কথার তোড় থামানোর জন্যে আমি বললাম, "আপনার নামটা কিন্তু অ্যাদ্দিনেও আমার জানা হল না।"

"দাদুর দেওয়া নাম। নয়নাংশু — নয়নাংশু বিশ্বাস।" শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখে হয়তো সামান্য হাসির ঝিলিক উঁকি মেরে থাকবে। সেটা লক্ষ করে ভদ্রলোক বললেন, "আমার নিজের কেমন মজা লাগে ভাবতে। আর যেদিন বেলেঘাটায় তিনটে ছেলেকে গুলি করে মেরেছিলুম, তারপর ওদের লাশগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কী মনে হচ্ছিল জানেন — নিজের নামটার কথা। নয়নাংশু — অর্থাৎ চোখের থেকে বেরনো জ্যোতি। কীসের জ্যোতি — জানের ?' মানবিকতার ?"

নতুন বোতল এল। আমার গেলাস খালি হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। সুবিধে হল। নতুন করে আর একটা নিজের জন্য আনতে হল না। উনিই এগিয়ে দিলেন।

"তো যেটা বলছিলুম। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমার প্রথম স্বপ্নভঙ্গ কবে কীভাবে ঘটেছিল। সেটা ছিল দোলের দিন। সকাল থেকে রঙ মেখে ছুটোছুটি করছি এখানে সেখানে। দোল উপলক্ষে বাড়িতে ভিয়েন বসিয়ে দাদু ঢালাও বোঁদে আর সীতাভোগ তৈরি করাতেন। তারপর সারা গ্রামে বিলি করা হত। মুঠোভর্তি বোঁদে নিয়ে আমি আর পুটু, মানে আমার ছোট ভাই বাড়ির পেছনে পুকুরপাড়ে গিয়ে বসলুম একসময়। তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগলুম। ওই জায়গাটা ছিল আমার খুব প্রিয়। কলকাতা থেকে ডাকে পাঠানো 'মৌচাক', 'রংমশাল' পড়তুম ওখানে দুপুরবেলা বসে বসে। আর কোনও কোনও দিন রাত্তিরবেলা ছাদে উঠে পুকুরটার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। মনে হত ওই পুকুরে জলপরীরা নেচে বেড়াচ্ছে। এককথায়, পুকুরটা আমাকে টানত খুব। হঠাৎ পুটুর আমাকে বলল, 'চল দাদা, মাছেদের বোঁদে খাওয়াই।' অসাধারণ প্রস্তাবে এককথায় রাজি হয়ে গেলুম। ঘাটের শেষ ধাপে বসে এক-একটা বোঁদে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলুম জলে। হঠাৎ শ্যাওলায় পা হড়কে আমি পড়ে গেলুম। পুটু চিৎকার করে কান্না শুরু করল। আর আমি জলের মধ্যে হাঁকুপাঁকু করতে লাগলুম। 'মা, মা' বলে ডাক দিলুম কয়েকবার। এখনও পরিষ্কার মনে আছে তখন আমার ভেতরে ভেতরে কীরকম হচ্ছিল। ভাগিস বসন্তমামার চোখে পড়ে যায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলেন। আমাকে প্রচণ্ড বকা দিতে দিতে যখন হিড়হিড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, তখন আমার মনে হচ্ছিল তোকে একেই বলে ডুবে যাওয়া। ব্যাপারটা তাহলে এতই সহজ — টুপ করে জলে পড়ে গেলেই হল। — জলপরী টলপরী কেউ আসবে না সাহায্য করতে। কাণ্ডটা যে সাঙ্ঘাতিক কিছু হয়েছিল, সন্দেহ নেই। ঠিক সময় বসন্তমামা এসে না-পড়লে হয়ত সত্যিই ডুবে যেতুম। পরে পুরো ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে হাত-পা সিঁটিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা হবার আগে পর্যন্ত 'জলে ডোবা' বলতে যে ভয়ঙ্কর এক মানসিক অভিজ্ঞতা ভেতরে ভেতরে কাজ করত, বাস্তব ঘটনা কিন্তু ততখানি তীব্রভাবে আমার ওপর রেখাপাত করল না। আমার ওই আগের মনে-হওয়ার পাশাপাশি আসল ব্যাপারটা খুবই সাধারণ লেগেছিল।

"এরপর আস্তে আস্তে যত বড় হলুম, জীবনের প্রতি আমার প্রচণ্ড দাবী কিংবা আশা — যাই বলুন, একে একে মিটিয়ে ফেলতে লাগলুম অসংখ্য দেশি-বিদেশি বই পড়ার মধ্যে দিয়ে। এমনই মারাত্মক ছিল আমার খিদে যে দু'একদিনের মধ্যে অ্যাত্তো মোটা মোটা উপন্যাস শেষ করে ফেলতুম, গড়গড়িয়ে আওড়ে যেতুম লম্বা লম্বা কবিতা। উহ্, এখন ভাবলে কীরকম গা ঘিনঘিন করে — কী করে অত লেখা পড়ে উঠতে পারলুম — সেইসব ভারী ভারী কথার মালা যা কবি-সাহিত্যিকরা এতদিন ধরে লিখে এসেছেন জীবনের অদৃশ্য দেওয়ালে। কেন, জীবনের দেওয়ালে কেন লিখতে গেলেন তাঁরা ? আমার মনে হয় সেটা এইজন্যে যে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফুজিয়ামার স্থালামুখের দোয়াতে ম্যামথের দাঁতের কলম চুবিয়ে আকাশের গায়ে আসল কথাটা লেখার ক্ষমতা তাঁদের কারও নেই। সেই আসল কথাটা কী : মানুষ নামের মধ্যেই স্বপ্নভঙ্গের স্থালা লুকিয়ে আছে। মানুষ তার কীর্তির ইমারত যতটুকু করেছে, তত মজবুত হয়েছে তার স্বপ্নভঙ্গের ভিত। এসব কথা আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা লিখতে ভয় পান। তাই জীবন সম্পর্কে লম্বা-চওড়া কথা বলে শিল্পসৃষ্টির

নামে ঝুড়িঝুড়ি মিথ্যে বোঝাই করে থাকেন।"

এতক্ষণে আমি ভালভাবে তাকানোর চেষ্টা করলুম নয়নাংশুর দিকে। নাম ধরে ডাকাই ভাল। বয়সে হয়ত আমার চেয়ে কিছুটা ছোট-ই হবে। কিন্তু সেটাই কি শেষ কথা ? এমনভাবে, এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে ও কথা বলে যাচ্ছে যেন কিছু একটা ভর করেছে ওর ওপর। কোনও পুরনো মাতালের ধ্যানধ্যেনে প্রলাপ নয়, সাদা পোশাকে বসে থাকা কোনও দায়িত্ববান প্রশাসনিক কর্তার পরিপাটি বক্তব্য নয় — যেন অন্য কেউ বলছে, মানুষের থেকে কিছু দূরে, কিংবা হয়তো কোনও মানুষ, দেবতা বা প্রেতে ভর-করা।

নয়নাংশু বলে যায় : "একদল কবি আছেন যাঁরা মনে করেন স্বর্গসুখের ঠিকানা পেয়েছেন। সেইজন্যে তাঁরা বলেন যে জীবনে কথা অর্থাৎ শব্দের ব্যবহার কী অকিঞ্চিৎকর। আমি কিন্তু ঠিক উলটো কথা বলি। আমার মনে হয় জীবনের দারিদ্র্য কিংবা সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি শব্দ — অর্থাৎ আমাদের মুখের ভাষা কী প্রচণ্ড ঐশ্বর্যশালী, কী ভীষণ সম্ভাবনাময়। আপনি দেখুন, আপনি যে জীবনে প্রতিমুহূর্তে আনন্দ কিংবা ব্যথা পান, দুটোই কী সাঙ্ঘাতিক রকমের সীমিত, নয় কি ? আপনিই বলুন না, আপনি যখন অচেতন হয়ে যান, তখন শারীরিক কষ্ট কিংবা সুখের আর কি কোনও মূল্য থাকে ? কিছু থাকে না। একইভাবে আপনার মানসিক যন্ত্রণা কিংবা আনন্দেরই বা ভূমিকা কী, যদি আপনার মন হয়ে যায় স্থূল, ভাবলেশহীন। কিন্তু ভাষা — ভাষার ক্ষমতা সমস্ত কিছুরই সীমানার বাইরে। যে আনন্দ বা যে যন্ত্রণাবোধ আপনি কোনও না কোনও সময় হারিয়ে ফেলেন নিজের কাছে, তা কত সহজেই, সামান্য কিছু আন্তরিক শব্দের ব্যবহারে, আপনি আর একজনের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন — এই যেমন এখন আমি আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।"

কথাটা শেষ করেই তো হো হো করে হেসে উঠে নয়নাংশু। যেন কোনও অতিসূক্ষ্ম ব্যক্তিগত রসিকতা একা-একাই ভোগ করে। তারপর হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গিয়ে আমাকে বলে, "আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, দোষটা কি আমার, যদি দেখি আমার বুকের ভেতর দলা পাকানো জানা-অজানা অনুভূতিগুলো শব্দের আকার নিয়ে এক এক করে উঠে আসতে চায় ?"

কষ্ট করে হেসে বলার চেষ্টা করি, "না, না, তা কেন হবে ? আপনি বলুন না, আমার শুনতে ভালই লাগছে।"

নয়নাংশু নতুন করে গেলাস ভর্তি করে। "একসময় দেখলুম আমি পুরোপুরি জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছি — সেই জীবন, যেটাকে ছোটবেলার থেকে আমি জেনে এসেছি হয় আগাগোড়া ভাল নয় মন্দ। শুরু হল আমার অভিজ্ঞতা অর্জনের পালা। কিন্তু আমি মুখিয়ে রইলুম কবে কখন কী করে আমার সবচেয়ে বড় আশার পূরণ হবে। কবে আমি জানতে পারব আমার ভেতর লুকিয়ে থাকা আসল খবরটা। পড়াশোনার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলাম, দেখলাম অজস্র চিত্রকলা, শুনলাম অসংখ্য সঙ্গীত, ঘুরে বেড়ালাম দেশের সবচেয়ে সেরা জায়গাগুলোয়। কিন্তু সব কিছুর পরই মনে হতে লাগলো : 'খুবই সুন্দর। কিন্তু — এটাই কি সব ? এটাই কি শেষ সৌন্দর্য ? এর চেয়ে আরও বেশি সুন্দর কোনও কিছু কি নেই ?'"

নয়নাংশুর কথা আর একটু বেশি জড়িয়ে আসতে লাগল। কিন্তু ওর প্রত্যেকটা কথা ভাল করে শোনার জন্যে আমি কান খাড়া করে রইলুম।

"আসলে কোনও কিছু দেখেই আমি ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারি না। আমার সবচেয়ে গণ্ডগোল বোধহয় এটাই। কেদারনাথ যাবার সময় পথের ধারে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। নিচে, অনেক নিচে, খাদ। সরু জলের ধারা বয়ে চলেছে কুলকুল করে। আর আমার পায়ের কাছে ওই গভীর তল থেকে লাফ দিয়ে উঠে এসেছে খাড়া পাথরের দেওয়াল। নিচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার মনে হল — এখান থেকে যদি পড়ে যাই, কী হবে ? তারপর নিজেই নিজেকে বললুম, 'যদি সত্যিই পড়ে যাই, তখন পড়তে পড়তে নিজেকে জিজ্ঞেস করব — এবার তো আমি সত্যি-সত্যিই পড়ছি। কিন্তু তাতে কী হল ? আমি অতল খাদে পড়ে গেলে কী এসে যাবে এই পৃথিবীর ? অর্থাৎ আমার পড়ে যাওয়া ওই পড়ে যাওয়াতেই শেষ'।"

ওই দূরে কীসের হট্টগোল লেগেছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে আবার নয়নাংশুর দিকে চোখ ফেরালুম।

"আমার কথাবার্তা শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া আমি কোনও কথা বলি না। কলেজে থাকতে আমি একজনের প্রেমে পড়ি। একেবারে হেড ওভার হীল্স বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। যাই হোক, প্রেম তো করতে লাগলুম চুটিয়ে। মহানন্দে দিন কাটতে লাগল। হঠাৎ এক মস্ত রোদের বিকেলে কীরকম গণ্ডগোল হয়ে গেল সব। আমার লেডিলোভ সাদা বাংলায় আমাকে জানিয়ে দিলেন যে খুব শীগগিরই উনি এক সৎপাত্রকে বিয়ে করছেন, এবং মেলোড্রামার পুরো মাত্রাটা টেনে আমাকে নিমন্ত্রণের কার্ড ধরিয়ে দিলেন। কী মনে হয় আপনার — এর চেয়ে শকিং আর কী হতে পারে ?" নয়নাংশুর প্রশ্নে আমি কথা না-বলে একগাল হাসলুম। এ-রকম পরিস্থিতি আর এহেন প্রসঙ্গে হাসাটাই শ্রেষ্ঠ উত্তর। নয়নাংশু বলে চলল : "এরপর কিছুদিন অসহ্য কষ্টে কাটিয়ে দিলুম। যদ্দুর মনে পড়ছে, ক'দিনের জন্যে বিছানা নিতে হয়েছিল। সারারাত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতুম ফ্যাল্‌ফ্যাল করে। তারপর একদিন মনে হল — এই কি তাহলে জগতের কঠিনতম দুঃখ যা মানুষ পেয়ে থাকে ? বেশ, ভাল কথা — কিন্তু এটাই কি সব ?"

নয়নাংশুর সিগারেট নিভে গিয়েছিল। দু'বারের চেষ্টায় ও যখন ধরাতে পারল না, আমার দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসল।

আমি বুঝলুম এক বোতলের সঙ্গীকে এবার সাহায্য করার সময় এসেছে। আমি জ্বালিয়ে দিলুম ওর সিগারেট, বুকভর্তি ধোঁয়া টেনে নয়নাংশু বলল: "এবার আমার জীবনের একটা আনন্দের অভিজ্ঞতা শুনুন।" থামল একটু। "কিন্তু বলেই বা কী হবে — সেও তো শেষমেশ একই হতাশা। অভিজ্ঞতাটা হবার পর মনে হল, এটাই সবচেয়ে বড় আনন্দ — কিন্তু এরপর কি আর কিছু নেই। আসলে নিজের জীবন থেকে যত অভিজ্ঞতার উদাহরণ বোঝাই করে আপনাকে বলি না কেন — সবকিছুই বলে দেবে যে জীবন নামক সাদামাটা, ক্লান্তিকর, ফাঁপা বস্তুটার থেকে আসলে স্বপ্নভঙ্গ বা হতাশা ছাড়া বেশি আর কিছু পাবার নেই। একটা জায়গায় পৌঁছে জীবন তার সবটুকু উজাড় করে দিয়ে ফুরিয়ে যায় — ফুরিয়ে যায়। কিন্তু আমি তো মানুষ। আমি ফুরিয়ে যাওয়া সইবো কেন? তাই বারবার ঘটে স্বপ্নভঙ্গ, বারবার আসে হতাশা। মহাভারতের কর্ণের কথা মনে পড়ে কি আপনার? তাঁর সমস্ত বীরত্বের গরিমা কিংবা ব্যর্থতার গ্লানির মহানায়কোচিত ভূমিকার আড়ালে যে মানুষটাকে বারবার আমরা দেখতে পাই সে শুধুমাত্র একজন মানুষ, ভালয় মন্দয় মেশানো, পৃথিবীর ঠাণ্ডা, মরা জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা ঠিক যেন সমুদ্রের মতো। আপনি কূলে দাঁড়িয়ে যতই সমুদ্রের অসীমতার কথা ভাবুন না কেন, দূরে তাকালে দেখবেন, দিগন্ত বেড় দিয়ে রেখেছে সমুদ্রকে। কিন্তু আপনিই বলুন, কেন আমাদের এবং অসীমতার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে দিগন্ত, কেন আপনার শ্রেষ্ঠতম আনন্দ আর কঠিনতম কষ্ট কেবলমাত্র কোনও তুচ্ছ জাগতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শেষ হবে। হয়তো এমন হতে পারে যে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা পরিধি খুবই ছোট। হয়তো আমি খুব সহজেই কোনও কিছু সম্বন্ধে অধৈর্য হয়ে পড়ি তার পুরোটা জানতে না পারলে।

"কিন্তু সেটা যে আসলে সত্যি, এমন কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আর ওই যে সব কবি-সাহিত্যিকদের কথা বললুম, যার জীবনকে সুগন্ধী এলাচ গুঁড়োমাখা সন্দেশ বলে চালাতে চান আর তাদের কথামতো বেশির ভাগ মানুষও তাই ধরে বসে থাকেন — যখন দেখি এসব তখন মনে হয় পৃথিবীটা খেতে না-পাওয়া শেয়ালের ভিড়ে ভরে গেছে, যারা দিনের আলোয় বেরোলে সিংহের মুখোমুখি হবে বলে রাতের অন্ধকারে অন্য পশুর অভুক্ত শিকারের সন্ধানে বেরোয়।"

ফাঁকা হয়ে এসেছে টেবিলগুলো। কমে এসেছে চিৎকার চেঁচামেচি। নয়নাংশুর দিকে তাকিয়ে বুঝলুম বড্ড নেশা হয়ে গেছে। বরং ওর কথা শুনতে শুনতে আমারটাই ঠিক জমেনি। পকেট থেকে একদলা নোট বের করে দাম মিটিয়ে নয়নাংশু যখন উঠল, তখন ওর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। ধরে ধরে ওকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠলুম। কোনওরকমে জেনে নিলুম বাড়ির ঠিকানাটা।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামার আগে নয়নাংশু আবার একদলা নোট বের করে আমার হাতে গুঁজে দিল। "রেখে দিন মশাই।" হাত নেড়ে ও কোনওমতে বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছল। দরজা না-খোলা অবধি আমি ট্যাক্সিতে বসে রইলুম।

আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে নামতে যাব, হঠাৎ পাশে সীটের ওপর কী একটা শক্ত জিনিসে হাত ঠেকল। তুলে দেখি রুমালে জড়ানো একটা সার্ভিস রিভলভার। প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে বসতে কষ্ট হচ্ছিল বলে বোধ হয় নয়নাংশু পাশে রেখে থাকবে। ঘোরের মধ্যে পরে তুলে নেবার কথা আর খেয়াল ছিল না।

পরদিন সকালেই আবার ফিরে গেলুম ওর বাড়ি। দরজা খুলল এক পাতলা চেহারার ছোট্টখাট্টো ভদ্রমহিলা। বুঝলুম নয়নাংশুর স্ত্রী। জিজ্ঞেস করে জানলুম নয়নাংশু তখনও ঘুমোচ্ছে। আমি জিনিসটা ওর হাতে দিয়ে বললুম, "ও গতকাল ট্যাক্সিতে এটা ফেলে এসেছিল।" মাঝরাতে মদ্যপ স্বামীকে যে লোক ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেয় তার প্রতি কৃতার্থ থাকার বদলে বাঙালি স্ত্রীর দল কিঞ্চিৎ বৈরিভাবাপন্ন হন। ভদ্রমহিলার মুখেও তারই ছায়া লক্ষ করলুম।

এরপর বহুবার নয়নাংশুর বাড়ি গেছি। ওরই নিমন্ত্রণে। ওর এক বিশেষ বন্ধু এসে যোগ দিতেন কখনও সখনও। দলীপ রাওয়ালের মুখেই শুনি নয়নাংশু ছবিও এঁকে থাকে। পীড়াপীড়ি করাতে ও অবশেষে একদিন খাটের তলা থেকে খবরের কাগজে মোড়া একগাদা ছবি বের করল — স্কেচ, প্যাস্টেল, জলরং। নির্দিষ্ট কোনও বিষয় নেই, যেন সবক'টাই ঘোরের মধ্যে আঁকা। একঝলকে দেখে বোঝা যায় না কিছু। কিন্তু একটানা তাকিয়ে থাকলে চোখে যেন নেশা লাগে। ঠিক ওর কথা শোনার মতো। রাওয়াল সাহেব আমাদের দু'জনের থেকেই বয়সে অনেক বড়। আর্কিটেক্ট। বিপত্নীক। ভদ্রলোকের খুব ইচ্ছে নয়নাংশুর ছবির একটা এক্জিবিশন হোক।

আমরা যতক্ষণ নয়নাংশুর বাড়িতে থাকতুম, পানের সময়টুকু ছাড়া মৈত্রেয়ী, অর্থাৎ ওর স্ত্রী এক মনোরম সঙ্গ জুগিয়ে যেত। পঞ্চম রিপুর প্রতি ওর এই অপছন্দটুকু আমার ক্রমশ গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। খুবই উচ্ছল, প্রাণবন্ত মেয়ে মৈত্রেয়ী। আমাদের মীরার ভজন শুনিয়েছিল দু'দিন।

নয়নাংশুর বাড়িতে যেটা দেখে অবাক হয়ে যেতুম সেটা হল ওর পাহাড়-প্রমাণ বইয়ের সংগ্রহ। এত বই ও পড়ল কবে? আমাকে একদিন এমিল লুডউইগ-এর 'নেপোলিয়ন' বইটি পড়তে দিয়েছিল। আগে অবশ্য কথাপ্রসঙ্গে জানতে পেরেছিলুম নেপোলিয়ন সম্পর্কে ওর গভীর অনুরাগ। বইটা হাতে দিয়ে আমাকে বলল, "দেখবেন পড়ে একজন মানুষের সীমাহীন হয়ে ওঠার ইতিহাস। মাঝে মাঝে মনে হয় ওয়াটার্লু-র পরাজয় নয়, এই সীমাহীন হবার আকাঙ্ক্ষাই মানুষটার জীবনে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। বীরত্বে সীমাহীন হওয়া নয় — নিজের সত্তার সবটুকু উজাড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ছাপিয়ে যাবার চেষ্টা। মানুষের যেসব

জৈবিক সীমাবদ্ধতা, সেই সমস্ত কিছু এই ছোট্ট লোকটা গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।"

একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ির ছাদে বসে নয়নাংশু আমাকে বলল, "জানেন, অনেক রাত আমি আকাশের তারা দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাটিয়ে দিই।"

আমি বললুম, "কেন, সময় কাটে না বুঝি?"

"না, ঠিক তা নয়। তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা আসলে সীমিত পৃথিবী এবং সীমাবদ্ধ জীবনের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। জানেন তো, রাতের আকাশের দিগন্ত বলে কিছু নেই। অন্ধকারে সব লোপাট। ঠিক যেমনটি আমি জীবন এবং পৃথিবীকে দেখতে চাই — দিগন্তহীন।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি। নয়নাংশুর কথার সবটুকু কেমন যেন বুঝেও বুঝে উঠতে পারি না। নয়নাংশু বলে যায়: "সেইজন্যে আমি অপেক্ষা করে আছি, স্বপ্নই দেখি বলতে পারেন, মৃত্যুর জন্যে।"

আমি হেসে বলি, "কিন্তু এই জগতে মৃত্যু বোধহয় একমাত্র জিনিস যার ক্ষেত্রে কোনও স্বপ্নভঙ্গ ঘটে না। ওটা তো অনিবার্য, অনিঃশেষ। তার শুরুই বা কোথায় আর শেষই বা কোথায়?"

নয়নাংশু বলে, "আমার ঠিক সেরকম মনে হয় না। আমার মনে হয় মৃত্যু তাড়াতাড়ি আসুক আমার জীবনে। আমি স্বজ্ঞানে মরতে চাই, এবং মরার আগে মৃত্যুকে বলতে চাই — ব্যস্, তুমি তাহলে এইটুকুই? কিন্তু তুমি তো তোমাতেই শেষ, তাই না? কিন্তু আমি যে অপেক্ষা করে আছি তোমার পরেও কিছু আছে কি না দেখব বলে।"

ওর কিছুদিন বাদে রানীগঞ্জে কয়লাখনিতে ওভারসীয়ারের চাকরি জুটিয়ে চলে যাই। ব্যস্ততায় কেটে যায় আট বছর। অনেক পরিশ্রম এবং সামান্য বাঁকা পথের আশ্রয় নিয়ে পায়ের মাটি শক্ত করে তুলি। একসময় হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করি বিবাহিত এবং দায়িত্বশীল গৃহস্থ হিসেবে। নয়নাংশুর কথা মনে রাখার ফুরসৎ পাই না। ওর ধোঁয়াটে দর্শনও ধীরে ধীরে মন থেকে মুছে যায়।

সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্যে মামলা মোকদ্দমা লড়তে আমাকে একসময় পরপর কিছুদিন কলকাতা আসতে হয়। মাথার ঘাম এবং পকেটের টাকা ফেলে একসময় জিতেও নিই আমার লভ্যাংশ। শেষদিন যাবতীয় কাজকম্মো চুকিয়ে বুকিয়ে মনের আনন্দে কোনও কেতাদুরস্ত বার-এর উদ্দেশে পা বাড়াই। আমার পকেটে এখন কেতাদুরস্ত বার-এ বসে দু'তিন পাত্তর চড়ানোর রেস্ত সবসময়ই থাকে। হঠাৎ পথে রাওয়াল সাহেবের সঙ্গে দেখা। আরও বুড়িয়ে গেছেন। আমাকে চলন্ত গাড়ি থেকে দেখে একবারেই চিনতে পারলেন। ডেকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন খবরাখবর। আমি নয়নাংশুর খবর জানতে চাইলুম। গম্ভীর মুখে উনি বললেন, "জিজ্ঞেস করবেন না। একটা বিশ্রী ব্যাপার।"

কোনও কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে বারণ করলে আরও বেশি করে জানতে চাওয়াটা মানুষের এক সাধারণ স্বভাব, এবং আমি কখনওই তার ব্যতিক্রম নই। আমি জোর করতে রাওয়াল সাহেব জানান, বছর পাঁচেক আগে নয়নাংশু আত্মহত্যা করেছে। শেষের দিকে ও চাকরিতে একেবারেই যেত না। সবসময় মদে চুর হয়ে থাকত। একদিন রাতে হাতের শিরা কেটে —।

স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। নয়নাংশুর যে ছবি আমার মনে সেই মুহূর্তে ভেসে উঠল, তাতে ঘটনাটা শুনে স্তম্ভিত হওয়ারই কথা।

"কারণটা কী? জানতে পেরেছেন কিছু?" কোনও রকমে জিজ্ঞেস করি।

"নয়নাংশু মারা যাবার বছর দুয়েক আগে ওর এক ছেলে হয়। নয়নাংশুর ধারণা ছেলেটা ওর নয়। তাই।"

"মানে?" চিৎকার করে উঠতে গিয়ে আমি থেমে যাই। মৈত্রেয়ীর ব্যক্তিত্বভরা মুখটা চোখের সামনে একঝলক ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। ওর চেয়ে সুস্থির, সংযত এবং দায়িত্ব সচেতন স্ত্রী নয়নাংশুর পক্ষে আশা করা অসম্ভব ছিল। "এখন মৈত্রেয়ী কী করছে?" জানতে চাই কোনও রকমে।

"একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করছে। আগের কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। ছেলেকে নিয়ে একাই থাকে। বাপের বাড়িও যায়নি।"

জানলা দিয়ে ছুটন্ত বাড়ি, ঘর, গাড়ি, গাড়ি, মানুষ দেখতে দেখতে আমার বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ক্ষীণভাবে মনের ভেতর একটু একটু করে জেগে উঠতে লাগল নয়নাংশুর বলা কথাগুলো। কে জানে, হয়তো সত্যিই মৃত্যুর সীমাবদ্ধতাকে স্বজ্ঞানে উপলব্ধি করার জন্যে ও বেছে নিয়েছে এরকম পরিণতি। আর রাওয়াল সাহেব এবং তার মতো আরও অনেকে নিজেদের পছন্দমতো একটা যুক্তি বের করে নিয়েছেন।

"কি ভাবছেন?" আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাওয়াল সাহেব।

"ভাবছি — জীবন এইরকমই।" মৃদু হেসে উত্তর দিই।

পুনশ্চ বাংলাদেশ

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাত বছর আগে বাংলাদেশ দেখে আসার পর আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে (বাংলাদেশ! বাংলাদেশ!!, সমতট প্রকাশন, ১৭২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা- ৭০০ ০২৯) লিখেছিলাম যে ওদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে এই অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ কোমর বেঁধে লড়াই করছে। আমার মনে হয়েছিল যে এই লড়াই-এ অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়ী হবার সম্ভাবনা বেশ স্পষ্ট আর সেই জন্য ওদেশের সংখ্যালঘু — বিশেষ করে হিন্দুদের ভয়ের কারণ নেই।

ইতিমধ্যে পদ্মা-গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। তাই এবারে (১৯৯৪ খ্রি ২৮শে জানুয়ারি থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি) আবার বাংলাদেশ যাবার পূর্বে যখন আপনার* সঙ্গে দেখা হয়, আপনি আমাকে দু'টি বিষয়ে বিশেষ করে খোঁজ নিতে অনুরোধ করেছিলেন। প্রথমত, বাংলাদেশের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার পূর্বের ধারণার পরিবর্তন করার কারণ আছে কি না? কারণ ইতিমধ্যে ওদেশ থেকে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগী হয়ে ভারতে চলে আসার খবর নিয়মিত ভাবেই পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ যদি ১৯৮৭ খ্রি আমার দেখা ঠিক হয়েও থাকে, ইতিমধ্যে সেই অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী শক্তি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়াই-এ অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষ হয়ে পড়েনি তো, যার কারণ বাংলাদেশের হিন্দুদের উদ্বাস্তু হওয়া? আপনার দ্বিতীয় অনুরোধ ছিল, ওদেশের মধ্যবিত্ত বিশেষ করে উচ্চ মধ্যবিত্তদের হাল-হকিকৎ জানার চেষ্টা করা। এর কারণ হল এই যে বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান ধারক ও বাহক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সাচ্ছন্দ্য প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে শোনা যাচ্ছে, যখন কিনা ওদেশের নীচের স্তরে দারিদ্র হ্রাসের তেমন কোন নিদর্শন নেই। মধ্যবিত্তদের এই বিপুল সমৃদ্ধি ও তজ্জনিত উপভোক্তাবাদ (consumerism) তাঁদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে এবং পরিণামে নবসৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ছে।

আপনার দু'টি প্রশ্নই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল বলে এর জবাব খোঁজার জন্য যতটা পারি এবারকার বাংলাদেশ ভ্রমণের সময়ে আমার চোখ-কান খোলা রাখার চেষ্টা করেছি। তবে প্রথমেই স্বীকার করে রাখা ভাল যে, প্রথম জিজ্ঞাসাটির প্রতি আমি যতটা দৃষ্টি দিতে পেরেছি, দ্বিতীয়টির প্রতি ততটা নয়।

এবারে আমার অভিজ্ঞতার বিবরণ পেশ করি।

॥ ২ ॥

কিছুদিন পূর্বে ইতিহাসের খ্যাতনামা অধ্যাপক অমলেন্দু দে মহাশয়ের একটি বই-এ (ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা; রত্না প্রকাশন, ২/৭৩ বিবেকানগর, কলিকাতা; ১৯৯২) পরিশিষ্টে বাংলাদেশের জনগণনার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যে তথ্য পাই তাতে দেখেছি যে ১৯৪১ খ্রি (অর্থাৎ ভারত ও বঙ্গবিভাগের দশকের জনগণনায়) মুসলমান ও হিন্দুর শতকরা হার যেখানে যথাক্রমে ৭০.৩ এবং ২৮ ছিল, ১৯৮১ খ্রি তা যথাক্রমে শতকরা ৮৬.৬ ও ১২.১ হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদের শতকরা হার পরবর্তী চারটি জনগণনায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হিন্দুদের কমেছে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য যে তুলনায় অপর এক সংখ্যালঘু বৌদ্ধদের শতকরা হার তেমন কমেনি — ১৯৫১ খ্রি ০.৭-এর বদলে ১৯৮১ খ্রি শতকরা ০.৬ ভাগ। খ্রিস্টানদের শতকরা হার কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪১ খ্রি জনগণনায় যেখানে তাদের শতকরা হার ০.১ ভাগ ছিল, চল্লিশ বছর পর তা ০.৩ হয়েছে।

হিন্দুদের সংখ্যাহ্রাস সম্বন্ধে মোটামুটি একই তথ্য দিয়েছেন অসমসাহসী লেখিকা তসলিমা নাসরিন তাঁর 'লজ্জা' উপন্যাসের ভারতীয় সংস্করণে। একই অবস্থা তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের এক নবীনা আইনজীবি সুলতানা নাহার তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়'-এ (ঢাকা প্রকাশন, ঢাকা)। এবারের একুশের বইমেলায় প্রকাশিত বেগম নাহারের গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হল বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশেরই সংখ্যালঘুদের অবস্থার পর্যালোচনা মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। বাংলাদেশের হিন্দুরা কেন দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন, তার তথ্যমূলক বিবরণ অত্যন্ত দরদী ভাষা ও ভঙ্গীতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির দু'টি অধ্যায়ে (প্রসঙ্গ কথা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ)।

সুতরাং একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে হিন্দুর শতকরা হার কমছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের হিন্দুরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দেশত্যাগ করছেন। বলা বাহুল্য, স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা প্রতিবেশী দেশ ভারতবর্ষেই আশ্রয় নিচ্ছেন। ওদেশ ভ্রমণের সময়ে আমাকে বারেবারেই এই সত্যের মুখোমুখি হয়ে হয়েছে।

সত্য কথা বলতে কি ঢাকা রওনা হবার দিনই বিমানবন্দরে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। সেখানে একজন সহযাত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল, যিনি রংপুর জেলার এক মহকুমা শহরের (এখন স্বতন্ত্র জেলার মানে পরিচিত) বিশিষ্ট পরিবহন ব্যবসায়ী। তিনি নিজেই স্বীকার করলেন যে তাঁর ব্যবসা খুব ভাল চলে এবং সংখ্যালঘু হবার কারণে কোন রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। ব্যবসা ছাড়াও যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আছে তাঁদের। কিন্তু তিনি ওদেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসতে চান। কেবল বিষয়-সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করে উঠতে না পারার জন্য চলে আসতে দেরী হচ্ছে। এদিকে তাঁর অন্যান্য ভাইরাই কেবল পশ্চিমবঙ্গে গুছিয়ে বসেননি, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরাও এদেশে। এরকম আরও অনেকের পরিচয় পেয়েছিলাম ওদেশে ঘোরার সময়ে। তাঁদের অসুবিধার কারণ ঘটাতে চাই না বলে সে সব নাম-ধাম অপ্রকাশিতই রাখব।

পূর্বোক্ত মানসিকতার আরও তিনটি উদাহরণ পেশ করব যেখানে আপাতত কোন সমস্যা না থাকলেও দেশত্যাগের ইচ্ছা ক্রিয়াশীল। ঢাকার এক প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হল যাঁদের বাড়ী বরিশালের ঝালকাঠি থেকে কয়েক মাইল দূরে। ঐ অঞ্চলের বার চৌদ্দটি গ্রামে এখনও তপশিলী হিন্দুরাই প্রবল সংখ্যাগুরু। দুই-চার ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ, নাপিত বা অপর বর্ণের হিন্দুরা আছেন। ঐ তপশিলী হিন্দুরা পেশায় কৃষক এবং অনেকেই ভাল রকম জমির মালিক। তাঁরা এমন সচ্ছল ও সংগঠিত যে তাঁদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল-কলেজও ঐ অঞ্চলে আছে। সংখ্যায় প্রায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ এবং সংগঠিত হওয়ায় ১৯৯০-৯১ খ্রি অথবা ১৯৯২-৯৩ খ্রি দাঙ্গা ঐ এলাকার মাথা তুলতে পারেনি। তবুও ভদ্রলোক দেশ ছাড়তে চান। বললেন, এখানে স্বস্তি বোধ করেন না। দেশত্যাগ যে তাঁর অথবা তাঁর ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের স্বার্থের প্রতিকূল — একথা বোঝাতে আমাকে বেশ মেহনত করতে হয়েছিল। শেষ অবধি কি হবে জানি না, তবে তখনকার মত তিনি আমার কথার মৌলিকতা উপলব্ধি করেছিলেন।

এক বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এক পদস্থ কর্মচারীর উপর দায়িত্ব দিলেন আমাকে রওনা করে দিতে। ভদ্রলোক পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এবং মনে হল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মালিকের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। আমাকে রওনা করে দেবার ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জানালেন যে তিনি দেশত্যাগ করতে মনস্থ করেছেন এবং আমি যদি ভারতে কোথাও তাঁকে গৃহ কিনতে সাহায্য করতে পারি তাহলে তিনি উপকৃত হবেন। তাঁর ছেলেও পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এবং সম্প্রতি ভারতে চাকরীতে নিযুক্ত হয়েছে।

অন্তিম উদাহরণ এক নবীন কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের, যিনি এক সরকারী হাসপাতালের কর্মী। ছাত্রাবস্থায়, সরকারী চাকরীতে নির্বাচিত হবার সময়ে অথবা চাকরীর ক্ষেত্রে কোথাও কেবল হিন্দু হবার জন্য তেমন কোন বৈষম্যে পীড়িত হতে হয়নি। তাঁর স্বভাব মধুর ও সংবেদনশীল এবং লক্ষ্য করেছি নিজ পেশার সহকর্মী ও রোগীদের (অধিকাংশই মুসলমান) সঙ্গে তাঁর মধুর, এমনকি পারিবারিক সম্পর্ক। রোজগারও ভাল এবং কাজে তৃপ্তি পান। তবু এক দুর্বল মুহূর্তে বলে ফেললেন যে সুযোগ পেলে তিনিও দেশত্যাগ করতে চান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-উত্তর বিশ্বে আরও ভাল রোজগারের আশায় বিদেশে যাওয়া এবং এমনকি স্থায়ী বসতি স্থাপন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে এবং সমাজের গতিশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, আরব দেশ এবং এমনকি আফ্রিকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন দেশে উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য যাওয়া, অথবা দেশত্যাগী হয়ে বসতি স্থাপন করা কারও মনে কোন প্রশ্ন সৃষ্টি করে না। বাংলাদেশের মুসলমানদের মতো হিন্দুদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুরা দেশত্যাগী হয়ে ভারতে এলে মানুষের ললাট কুঞ্চিত হয়। ওদেশেও এবং ভারতেও। প্রশ্ন জাগে কেন এই দেশত্যাগ ঘটছে? যে দেশত্যাগ আরও সম্পন্ন ভবিষ্যতের জন্য — তা বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতে হলেও তার জন্য উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। কিন্তু যে উদ্বাস্তু হবার পিছনে সংখ্যালঘু হিসাবে অসহ্যতা ও নিরাপত্তার অভাববোধ, সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং সংখ্যাগুরুবাদের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন চাপ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ঔদাসীন্য কিংবা বিরূপতা তার প্রতি সচেতন না হওয়া আধুনিক সভ্য সমাজের মূল্যবোধ বহির্ভূত আচরণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণেও বাংলাদেশের হিন্দুরা এখনও দেশত্যাগী হচ্ছেন। যেসব কারণে আমি ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তা চাই সেই একই কারণে বাংলাদেশের হিন্দুদেরও শান্তি ও উদ্বেগবিহীন অবস্থায় খেটে খাবার সুযোগ পাচ্ছেন দেখতে চাই।

তাৎকালীক কোন দৃষ্টিগোচর প্রবল কারণ না থাকলেও মনের ভিতর তিলে তিলে দীর্ঘকাল ধরে পুঞ্জীভূত অসহ্যতা, নিরাপত্তার অভাব অথবা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন বৈষম্য কিংবা অপমানের শিকার (কয়েক বার শ্রুতিগোচর করে 'মলাউন' উচ্চারণ করাই যথেষ্ট) হলেও দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে থাকে। তবে মূলত মনোবৈজ্ঞানিক কারণে হিন্দুদের বাংলাদেশ থেকে দেশান্তরী হবার যেসব কারণ

* লেখক প্রবন্ধটির সূচনা অংশ লিখেছেন, চতুরঙ্গের নির্বাহী সম্পাদক আবদুল রউফকে সম্বোধন করে।

ঘটছে, তার প্রেরণা জোগাচ্ছে দু'টি স্থূল অবস্থা।

এর প্রথমটি হল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সংবিধানের চারটি মূল স্তম্ভের অন্যতম — ধর্মনিরপেক্ষতাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সঙ্গে অপসারিত করা। স্বভাবতই হিন্দু-সহ ও-দেশের তাবৎ সংখ্যালঘুরা এর ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়ে পড়েন। শতকরা ৮৬ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রথমে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম 'রাষ্ট্র সংবিধান ও ধর্ম' নামে একটি জোরালো প্রবন্ধ লেখেন। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ১৪ই জুলাই ১৯৮৮ খ্রি ভূমিকা-সহ প্রবন্ধটি পুস্তিকার আকারে পুনঃপ্রচারিত হয়। অতঃপর ধাপে ধাপে জিয়াউর রহমান ও এরসাদের আমলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্রকে বেশ প্রকট ভাবে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করতে করতে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের স্থান দেওয়া হয়। সংখ্যালঘুদের কাছে এর ব্যঞ্জনা খুবই স্পষ্ট। আর সংখ্যায় অল্প হলেও উগ্র সাম্প্রদায়িক বা গোঁড়া ইসলামী মৌলবাদীরাও এর থেকে নিজেদের মতো করে শিক্ষা গ্রহণ করছে। বাংলাদেশে এরসাদের বিরুদ্ধে একটা মিনি গণবিপ্লবের ফলে বেগম খালিদার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রশাসনযন্ত্রের স্বৈরতন্ত্রী অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি-প্রধান সরকারের বদলে প্রধানমন্ত্রী-প্রধান সরকার ও নির্বাচিত সংসদের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এবং এটা সম্ভব হয়েছিল রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে ওদেশের প্রধান প্রধান গণতান্ত্রিক দলগুলির সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে একমত হবার জন্য। কিন্তু সেই সময়েই সংখ্যালঘুদের মনোবৈজ্ঞানিক নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য সংবিধানের অষ্টম সংশোধন (যাতে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়) বাতিল করা হয়নি। শুধু তাই নয়, (সন্দেহাতীত ভাবে দলের অধিকাংশের মুখ চেয়ে) বেগম খালিদার বি এন পি সরকারের প্রতিমন্ত্রী গয়েশ্বরচন্দ্র রায় সাংবাদিকদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছেন যে তিনি ঐ অষ্টম ধারার সংশোধন চান না। সাধারণভাবে আওয়ামী লীগকে ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকতর প্রবক্তা মনে করা হলেও এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সে দলের ভূমিকাও অস্পষ্ট। আমার বাংলাদেশে থাকাকালীন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা — এই চারটি শহরের করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, যা এক রকম মিনি সাধারণ নির্বাচনের রূপ নিয়েছিল। অন্য শহরগুলির সঠিক তথ্য আমার জানা নেই। তবে রাজধানী ঢাকাতে কোন জাতীয় রাজনৈতিক দলই এতগুলি কাউনসিলারের পদে একজনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিজেদের তরফ থেকে মনোনীত করেনি। ভোটের রাজনীতির দৃষ্টিতেও একে সমর্থনযোগ্য বলা যায় না। কারণ কোন দলের সব মুসলমান প্রার্থীই বিজয়ী হননি। সংখ্যালঘুদের দেশের রাজনৈতিক মূল ধারা থেকে দূরে রাখার এই প্রবণতার পিছনে যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল, তা আর যাই হোক হিন্দুদের ভরসা সৃষ্টির সহায়ক নয়।

দ্বিতীয় কারণটি হল পাকিস্তান আমলের 'শত্রু সম্পত্তি আইন' পরবর্তী কালে যার নাম হয়েছে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন'। এই আইনের ফলে বাংলাদেশের বাসিন্দা সংখ্যালঘুদের কী দুর্গতি তা ১৯৮৭ খ্রি সফরের সময়ই জানতে পেরেছিলাম এবং তখনই লিখেছিলাম। এবারে আইনটির বিরুদ্ধে কেবল হিন্দুরা নন, বহু নিরপেক্ষ মুসলমান বুদ্ধিজীবি আন্দোলন করলেও (মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হকের "বৈষম্যের শিকার বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়", শরীফ হোসেনের "বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ" ও অন্যান্য আরও অনেকের রচনা) কেন যে আইনটি এখনও বাতিল হচ্ছে না, তার আভাস পেলাম। এই আইনের দ্বারা অর্পিত সম্পত্তি যাদের বিলি করা হয়েছে তারা মোটামুটি সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই যুক্ত আছেন। ফলে মুখে মাঝে মধ্যে এর বিরুদ্ধে বললেও কোন রাজনৈতিক দলই সমর্থকদের প্রভাবে এ আইন বাতিল করার সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে ইচ্ছুক নয়। এর সঙ্গে বাংলাদেশে জমির অত্যল্প পরিমাণ, সম্পত্তির মালিক হবার জন্য মানুষের আদিম আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির কথাও খেয়াল রাখতে হবে। ফলে একবার বাংলাদেশত্যাগী কোন সংখ্যালঘুর যৌথ সম্পত্তির একাংশের এই আইনের ফলে বন্দোবস্ত পেলে বাকী শরিকের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের উচ্ছেদ করা সহজ হয়ে ওঠে। একই ভিটার মধ্যে হিন্দুদের নিষিদ্ধ খাদ্যের পাক ও আহারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া হিন্দুদের পক্ষে অসম্ভবপ্রায়। পুকুর-জলাশয়ের শরিকানা ইত্যাদির ব্যাপারেও অনুরূপ সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া যে কোন দেশের মতো বাংলাদেশেও আইনের দুরুপযোগ ঘটে। কোন সরকারী কর্মচারী অনায়াসেই কোন সংখ্যালঘুকে এই আইনের ফাঁদে ফেলে তাঁর সম্পত্তিকে সরকারে অর্পণ (vest) করাতে বা কোন অনুগ্রহ প্রার্থীকে বন্দোবস্ত দিতে পারেন। তারপর নিজের অধিকার সপ্রমাণ করার জন্য তিনি বছরের পর বছর আইন-আদালত করতে থাকুন।

॥ ৩ ॥

দাঙ্গাও (প্রচলিত শব্দটি ব্যবহার করলেও এসব ঘটনাকে বরং এক তরফা সংখ্যালঘু পীড়ন বলাই ভাল) বাংলাদেশ থেকে হিন্দু নিষ্ক্রমণের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ১৯৬৪ খ্রি-এর পর থেকে ১৯৮৯ খ্রি পর্যন্ত বাংলাদেশ দাঙ্গার অভিশাপমুক্ত ছিল। সাম্প্রতিক কালে হিন্দুদের অস্তিত্বের গোড়া ধরে নাড়া দেবার এইসব ঘটনার মূল কিন্তু বাংলাদেশে নয়, ভারতে। ভারতের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের জঙ্গী নেতারা সম্ভবত এক মুহূর্তের জন্যও ভেবে দেখেন না যে ভারতে হিন্দু

সংহতি ও স্বাধিকারের নামে বাংলাদেশ (এবং পাকিস্তানেও) তাঁরা হিন্দুদের কী সর্বনাশ করছেন। ভারতের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ইসলামী সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের সর্বাপেক্ষা প্রবল সুহৃদ। অত্যল্প সংখ্যক এইসব মৌলবাদীরা ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে ওদেশের গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিসমূহকে দুর্বল করার সুবর্ণ সুযোগ পান ভারতের বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার আন্দোলনে এবং শেষ অবধি তাকে ভাঙ্গার পর। ভারতে আমাদের — ওদের চেয়ে আমরা ভাল এই মানসিকতার কমঠবৃত্তি গ্রহণের উপায় নেই। রামায়ণের রাম কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নন জেনেও এবং সেই ত্রেতা যুগে যাঁর জন্ম হয়েছে তাঁর প্রসূতিগৃহ যথাযথভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে কেবল বিশ্বাসের বলে এই কথা মেনে এবং মীর বাঁকি কোন মন্দির ভেঙ্গে ঐ মসজিদ তৈরি করেছিলেন এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও হিন্দু মৌলবাদীরা যদি বাবরি মসজিদকে ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান বিরোধী দাঙ্গার সৃষ্টি করে থাকতে পারে তাহলে সংবাদপত্র, বেতার ও সর্বোপরি কেবল টেলিভিশনের কৃপায় আদালত, সরকার সবার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে দিন দুপুরে পাঁচ ঘণ্টা ধরে জঙ্গী হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা এক মসজিস ভাঙ্গার বিবরণ দেখে ও শুনে বাংলাদেশের জঙ্গী ইসলামীরা যদি প্রতিবেশী হিন্দুদের ধনপ্রাণ ও দেবস্থানের উপর হামলা করতে প্ররোচিত হয়, তাহলে তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু এই দুই সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখাগড়াদের প্রাণ যায়। ভারতের উলুখাগড়া সাধারণ মুসলমান, বাংলাদেশে তাঁরা হলেন হিন্দু সম্প্রদায়।

একথা সত্য যে বাবরি মসজিদ নিয়ে বাংলাদেশের তিন দফা দাঙ্গাই সরকার ও জনসাধারণ অতি দ্রুত (ভারতের তুলনায় অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত) নিয়ন্ত্রণে এনেছে। বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবতাবোধের প্রশংসা করতে হবে — ১৯৮৯, ১৯৯০ ও ১৯৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গায় প্রাণহানিও খুব কমই ঘটেছে। কিন্তু হিন্দুদের ধন-সম্পত্তি বিনাশ এবং মন্দিরের উপর আক্রমণের ঘটনা ব্যাপক। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে শান্তিপূর্ণভাবে পেটের ভাত জোগাড় করার সংগ্রামে সদাব্যস্ত হিন্দু সমাজের মন থেকে ঐ তিনটি দাঙ্গার ফলে নিরাপত্তার ভাব চলে গিয়ে বাংলাদেশে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চ পর্যায়ে সরকারের দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকা (এরসাদ বিরোধীদের একথা যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায় যে তিনি দাঙ্গা উস্কে দিয়ে পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করে নিজ কলঙ্কিত ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার কাজে ব্রতী ছিলেন) ও বাংলাদেশের গণতন্ত্রী ও অসাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের আন্তরিকভাবে হিন্দুদের সহায়তার্থ ঝাঁপিয়ে পড়া সত্ত্বেও ও দেশের দাঙ্গাপীড়িত হিন্দুদের এই আংশিক অসহায়তা যে তাঁদের নিরাপত্তার খোঁজে দেশের সীমান্তের বাইরে দৃষ্টিপাত করতে প্রেরিত করছে — একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না।

এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়ও জানতে পারলাম। ১৯৯২ খ্রি আগস্ট মাসে চট্টগ্রাম থেকে বিগত দুই বৎসরে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের উপর যেসব অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে তার প্রামাণ্য তথ্য (প্রধানত ফোটোগ্রাফ ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ-সহ) 'গ্লানী' নামে প্রকাশিত হয়। 'জাতির বিবেককে উৎসর্গীত' এ দলিলটির প্রকাশনা বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের তিন চেয়ারম্যান সি আর দত্ত বীর উত্তম, ভদন্ত বোধিপাল মহাথেরো এবং টি রোজারি-এর আশীর্বাদ পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, সেদেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের অগ্রগণ্য মাতৃস্থানীয়া কবি বেগম সুফিয়া কামাল, ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দীন হোসেন, চট্টগ্রামের আসাদ চৌধুরী, সেলিনা হোসেন, বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টচার্য এবং কে এম সোবহান, কবি শামসুর রাহমান, আইনজ্ঞ কামাল হোসেন এবং অধ্যাপক আনিসুজ্জামান প্রমুখ প্রথম সারির বুদ্ধিজীবিরা প্রকাশনটিকে লিখিত ভাবে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার জাতির বিবেকের প্রতি এই আবেদনকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এর কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকবে যে, বইটির কারণে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু তাতে 'গ্লানী'-তে প্রকাশিত তথ্যাবলী মিথ্যা হয়ে যায় না, বা তার আবেদনও বৃথা হয় না। পক্ষান্তরে সংখ্যালঘুদের মার খেলেও চেঁচিয়ে কাঁদার উপায় নেই — এমনি একটা ধারণার সৃষ্টি হয়। তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' উপন্যাসকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। বলা বাহুলা, এসব সরকারী পদক্ষেপ সংখ্যালঘুদের মনোবল ভঙ্গ করারই সহায়ক, যার কারণে হিন্দুরা বাস্তুত্যাগ করতে প্ররোচিত হয়।

'গ্লানী'-তে কয়েকটি তথ্য পাওয়া গেল যার প্রতি দৃষ্টি পড়া উচিত। ১৯৫৪ খ্রি থেকে জাতীয় সংসদে সংখ্যালঘুদের সদস্য সংখ্যা ক্রমাগত কমতে কমতে ৭২ জন থেকে ১৯৯১ খ্রি মাত্র ১২ জনে দাঁড়িয়েছে। যদিও সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা ঐ কাল পরিধিতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৯ থেকে ৩৪৫ হয়েছে। ১৯৯১ খ্রি সামরিক বাহিনীর মোট ৮০,০০০ জওয়ানের মধ্যে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা মাত্র ৫০০। উচ্চতর পদসমূহেও ঐ একই অবস্থা। একজন মাত্র কর্নেলের উপরের পদে আর কোন সংখ্যালঘু নেই। বাংলাদেশ রাইফেলস ও পুলিশেও ঐ একই অবস্থা। পূর্বে উল্লিখিত মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হকের যৌথ রচনা এবং শরীফ হোসেনের প্রবন্ধে প্রাগুক্ত তথ্যগুলির সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করা হয়েছে চাকুরীর সর্ব পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের উপযুক্ত হারে নিযুক্তির ব্যতিক্রমের অভিযোগসমূহের তদন্ত করার জন্য সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাশালী বোর্ড (আমেরিকার সিভিল রাইটস কমিশনের ধাঁচে) গঠন করা দরকার।

এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, ঠিকা ও ব্যাঙ্ক-ঋণ পাবার ক্ষেত্রে বৈষম্য বন্ধ করা দরকার। পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতা ও সরকারী প্রচারমাধ্যমে বৈষম্য প্রচার, সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত সভা-সমিতিতে কেবল কোরান পাঠ, সরকারী ছুটির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুবিরোধী প্রথা বন্ধ করা ইত্যাদি প্রস্তাবও তাঁরা করেছেন।

পূর্বোক্ত দাবিসমূহ সংখ্যালঘুদের মনোবল বৃদ্ধির কিছুটা সহায়ক হলেও এর সীমাবদ্ধতার প্রতিও সচেতন থাকা উচিত। সংখ্যালঘুদের নামে ঐসব সুযোগ-সুবিধা যাঁরা পাবেন বা এ-যাবত পেয়েছেন, সংখ্যালঘুদের স্বাধিকার রক্ষাই তাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হবে মনে করা ভুল। সরকারী কর্মচারীদের ঐসব বাহিনী স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের পর তাঁদের দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হল ঐ শ্রেণীর স্বার্থকে পুষ্ট করা। বাংলাদেশে মুসলমান কর্মচারীর আধিক্য যেমন ওদেশের জনসাধারণের গরিষ্ঠতম অংশ — খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের স্বার্থকে প্রধান্য দেয় না, ভারতে এক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য যেমন এদেশের অধিকাংশ মেহনতী মানুষের স্বার্থের ধারক ও বাহক নয়, তেমনি বাংলাদেশেও সংসদ বা চাকরী, ব্যবসা, ঠিকার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সব সমস্যার সমাধান নয়। একটা সীমার পর সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংরক্ষণের দাবি বুমেরাং হয়ে মূল দাবি অসাম্প্রদায়িকতার নীতিকেই আঘাত করে। মূল প্রশ্ন হল, রাষ্ট্র ও সমাজের ধর্ম নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক চরিত্র গড়ে তোলা।

॥ ৪ ॥

বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন হিন্দু স্ব-সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগের আরও কিছু কারণের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য আমার মতে, এই সব কারণের জন্য এদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ও সমানভাবে পীড়িত। ওগুলি কেবল সংখ্যালঘুদের সমস্যা নয়। তবু বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বোঝার জন্য ঐ কারণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

ওদেশে আর্থিক বিকাশের গতি অত্যন্ত মন্থর। নতুন কল-কারখানা তেমন খুলছে না। এরসাদের আমলে গ্রামাঞ্চলে শিল্প-ব্যবসা খাড়া করার জন্য সরকারের কাছ থেকে নানা ব্যক্তি বহু অর্থ নিলেও তার অধিকাংশতেই উৎপাদন হচ্ছে না। সেসব শিল্প ব্যবসায়ের ইউনিট হয় অসমাপ্ত আর নয় তার কাজ শুরুই হয়নি। দেশে যেসব কল-কারখানা চলছিল, ভারতের মতোই বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের চাপে বাজারের অর্থনীতি গ্রহণ করার জন্য তাদের মধ্যে এক হাজারের উপর (এর মধ্যে সরকারের পরিচালনাধীন কারখানাও আছে) বন্ধ হয়ে গেছে। 'সোনালী করমর্দন'-এর নামে সেখানকার শ্রমিক-কর্মচারীদের ছাঁটাই হচ্ছে। ফলে হিন্দুদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত। পেটের দায়ে তাঁদের সীমান্তের ওপারে পাড়ি জমাতে হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈরাজ্যের অবস্থা চলছে। পড়াশুনার পরিবেশ নেই জাতীয় দলগুলির ছাত্রশাখাগুলির রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য। প্রায়ই এ রাজনীতি খুনোখুনিতে পর্যবসিত হয়। আমার ছাব্বিশ দিন ওদেশে থাকার সময়ে এরকম অনেক খবর ওদেশের সংবাদপত্রে পড়েছিলাম। এর মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে মস্তানবাহিনী সৃষ্টি ও তাদের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ, ছাত্রদল কর্তৃক পরীক্ষা পরিদর্শককে হত্যা, চাঁদপুরে জামাতী মৌলবাদীদের দ্বারা নয়টি স্কুল পোড়ানো, ছাত্রাবাসে পুলিশ কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত চিন্তার চর্চা বন্ধ ও শাসক দল বি এন পি-এর ছাত্রনেতা খুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রাজনীতির প্রতি নিস্পৃহ ব্যক্তিরা আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের এই শোচনীয় অবস্থা রাজনৈতিক নেতাদের জ্ঞাতসারেই চলছে। তাঁরা আরও বললেন যে, নেতাদের ছেলেমেয়েরা ডলার খরচ করে প্রতিবেশী ভারত (ষাট হাজার বাংলাদেশী ছাত্র এখানে) অথবা আরও দূর দেশে পড়ছে। সুতরাং ওদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে পড়াশুনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাঁদের কোনও মাথাব্যথা নেই। পড়াশুনার জন্য যেসব সাধারণ পরিবারের হিন্দু ছাত্র ভারতে যেতে বাধ্য হচ্ছে তারা স্বেচ্ছায় তিন-চার বছর সময় নষ্ট করে ভারতের স্কুলসমূহে নিচের দিকে এমন ক্লাসে ভর্তি হচ্ছে যেখানে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য কড়াকড়ি করা হয় না। এতে নাগরিকতার প্রশ্নের সমাধানও আপনা-আপনি হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি খারাপ, অসামাজিক ব্যক্তিদের অত্যাচারে ধন-প্রাণ এবং নারীদের সম্ভ্রম সঙ্কটাপন্ন। এর উপর প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি — ঘুষ না দিলে কোথাও কিছুর সুরাহা হয় না। এসবও হিন্দুদের বাস্তুত্যাগে বাধ্য হবার কারণ এমন কথাও কেউ কেউ বললেন। ওদেশে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি যে ভাল নয় তা ওখানকার দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ পাঠের সময়েই মনে হয়েছে। আমার ঢাকায় থাকার সময়েই তিনটি বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যা নিয়ে শহরে আলোড়ন ছিল। করপোরেশনের নির্বাচনে পরাজিত এক কাউন্সিলার পদপ্রার্থীর প্ররোচনায় বিজয়ী পক্ষের সমর্থক সাত-আটটি যুবককে কোনরকম উত্তেজনার কারণ বিনাই গুলি করে নির্বিচারে হত্যা করা। আমি থাকাকালীন ঘটনার নায়ক গ্রেপ্তার হয়েছিল কিনা জানি না, তবে পুলিশের খুব সমালোচনা হওয়ায় তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। অপর একটি ঘটনা হল ধানমণ্ডির মতো অভিজাত পাড়ায় সন্ধ্যাবেলায় জাতীয় সংসদের জনৈকা মহিলা সদস্যা ধস্তাধস্তি করে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর গহনা ছিনতাই। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই যে আশেপাশে কয়েকজন মানুষ ঐ ঘটনা দেখলেও মহিলার সাহায্যার্থ দুষ্কৃতিকারীদের বাধা দেননি। তৃতীয় ঘটনা হল দিন দুপুরে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রিক্সার আরোহিনী জনৈকা অধ্যাপিকা ও তাঁর সঙ্গীনীর গহনা ছিনতাই। বলা বাহুল্য, এসব দরিদ্র দেশে কনজিউমারিস্ট বা উপভোক্তাবাদী অর্থব্যবস্থা ও সংস্কৃতি প্রবর্তনের ফল। গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে প্রতিনিয়ত মানুষের মধ্যে নানা উপভোগ্য বস্তুর চাহিদা সৃষ্টি করা হবে, অথচ কোটিকে গুটিকের হাতে ঐসব বস্তু পাবার মত অর্থসঙ্গতি সৃষ্টি হবে। এ অবস্থায় এ-জাতীয় জোর যার মুলুক তার অবস্থা জন্ম নিতে বাধ্য। কেবল বাংলাদেশ, ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশেই নয়, আমেরিকার মত সম্পন্ন দেশেও দরিদ্ররা এই অবস্থার শিকার। বাংলাদেশে পূর্বোক্ত ঘটনা তিনটিরই শিকার সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা। নারী নিগ্রহের ঘটনাও বহু ক্ষেত্রে পীড়িতরা মুসলমান সমাজের। মূল ব্যাপারটা পুরুষের আধিপত্যযুক্ত সমাজে নারীরা ভোগের উপকরণ মনে করার মানসিকতা এবং আক্রামক কামবৃত্তিতে নিহিত। ব্যাপারটা হিন্দু-মুসলমানের নয়। আর নিরাপত্তার আশায় যেখানে যাওয়া সেখানে যে হিন্দু মস্তান নেই এবং তাদের হাতে নিরীহ হিন্দু নিগৃহীত হয় না বা হিন্দু মহিলার সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয় না এমন কথা নয়। প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতির কারণে সাধারণ নাগরিকের দুর্গতি — এ ভারতেও কম নয়। এ-ব্যাপারে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, বি জে পি অথবা অন্যান্য দলের সরকারের মধ্যে বাছ-বিচার করার উপায় নেই।

বাংলাদেশে রাষ্ট্র প্রশাসন ও সমাজে দৃষ্টিগোচরভাবে উত্তরোত্তর ইসলামীকরণ হচ্ছে এবং এর ইঙ্গিত স্পষ্ট — অমুসলমানরা ওখানে অবাঞ্ছিত। অনেক হিন্দুর পূর্বোক্ত ধারণার পিছনে সত্য আছে বলে মনে হয়েছে। এর দু'টি স্থূল নিদর্শন — সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেওয়া এবং অর্পিত সম্পত্তি আইনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর আরও কয়েকটি বাহ্য নিদর্শন আমার চোখে পড়েছে। ড. আহমদ শরীফ ও বদরুদ্দীন উমরের লেখায় বার বার ১৯৭৫ খ্রি-উত্তর বাংলাদেশে ধর্মীয় উরস ও মহফিলের আধিক্যের কথা পড়েছিলাম। এবারে তার নমুনাও দেখলাম। তবে এসবের পিছনে যতটা না ধর্মভাবনা, তার চেয়েও বেশি আরব মুলুক থেকে সহজে মোটা টাকা পাবার লোভ এবং তারজন্য বাঙালি অস্মিতাকে গৌণ করে ইসলামী অস্মিতাকে মুখ্য করার চেষ্টা। বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এম আর আখতার মুকুল সাহেবের একাধিক লেখায় জেনেছি যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই শেখ সাহেবের সামনে ইসলামী অস্মিতাকে প্রধান করার জন্য কেমনভাবে পেট্রো ডলারের জাল ফেলা হত।

আমার চোখে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করে বাংলাদেশে ইসলামী অস্মিতাকে প্রবল করার চেষ্টার যে দুই একটি উদাহরণ ধরা পড়েছে তার কথা উল্লেখ করা যাক। ঢাকায় পহেলা ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণে বহু বছরের ঐতিহ্যসম্পন্ন একুশের বই মেলার উদ্ঘাটন করলেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খলিদা জিয়া। আবার ঐ দিনই রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস ইসলামী ফাউণ্ডেশনের বই মেলারও উদ্বোধন করলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রাণকেন্দ্র বাংলা একাডেমীর গুরুত্বপূর্ণ এক রকম জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো অপর একটি অনুষ্ঠান, যার আবেদন একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত, তার তাৎপর্য গভীর না হয়ে যায় না।

ঐ রকম একটি উদাহরণ ওদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এক রকম নিচের শ্রেণী থেকেই বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা। অষ্টম শ্রেণীর একটি ছাত্রীকে একশ নম্বরের জন্য ইসলামের যেসব বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পড়তে হচ্ছে তা মৌলবী বা মৌলানা হবার জন্য যে শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন করতে হয় তার থেকে কম মনে হল না। ধর্মের মূল কথা সুনীতিনিষ্ঠ জীবনযাপনের শিক্ষার উপর জোর দেবার বদলে তার বহিরঙ্গ — আনুষ্ঠানিকতা ও আচারের পিছনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এতটা সময় ব্যয় করার কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি নিরীশ্বরবাদী নই এবং প্রার্থনা-উপাসনায়ও বিশ্বাসী। তবু বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার নামে ঐ বাড়াবাড়িকে আমার অনেকটা লোক-দেখান ব্যাপার মনে হয়েছে। এতে কয়েক রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এক তো যে সময়টাতে বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও আধুনিক ধ্যান-ধারণার শিক্ষা দিয়ে সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বের দরবারে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা যেত, তার অপব্যয় হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, সব ধর্মেই অল্পাধিক গোঁড়ামি এবং অপর ধর্ম থেকে শ্রেয়োমন্যতার ভাব আছে। সুতরাং বিচার-বুদ্ধি পোক্ত হবার বয়সের পূর্বে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার রসায়ন বাধ্যতামূলকভাবে গিলিয়ে দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিক বিকাশ কুণ্ঠিত হবে এবং তাদের ভিতর ধর্মের ঔদার্যের বদলে গোঁড়ামি বৃদ্ধি ঘটবে।

শহিদুল ইসলাম সাহেব আমার মনের কথাটিই খুব সুন্দর ভাবে বলেছেন বলে এখানে তাঁর একটি চমৎকার রচনা থেকে (শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম, জিজ্ঞাসা, ত্রয়োদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা — ১লা মার্চ, ১৯৯৪ খ্রি 'ভাবনা-চিন্তা' পত্রিকায় উদ্ধৃত) উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। "প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মশিক্ষার ত্রুটি প্রধানত দু'টি। এক, একটি বিশেষ ধর্ম, সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মই সেখানে প্রাধান্য পায়। এতে শিক্ষার্থীর গণতন্ত্রবিরোধী মনোভাব তৈরী হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার্থীর মন মানসিকতা কূপমণ্ডূকতার ক্ষুদ্রতায় নিমজ্জিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রমাণ অপ্রমাণের আওতা বহির্ভূত কতকগুলি ধর্মীয় সিদ্ধান্ত 'ধ্রুবসত্য' হিসেবে শিক্ষার্থীর কচি মনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেমন লৌকিক হিন্দুধর্মে 'পুনর্জন্মবাদ' ধ্রুবসত্য বলে শেখানো হয়। যদি কখনও কোন বুদ্ধিমান ছাত্রকে এই প্রমাণাতীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করতে দেখা যায়, শিক্ষকবৃন্দ তখন তাকে নিরুৎসাহ করেন, এমনকি শাস্তি প্রদান করেন।

এভাবে শিক্ষক শিশুর প্রকৃতিদত্ত অনুসন্ধিৎসু মনকে নিঃশব্দে হত্যা করেন। এ ধরনের 'পাপকার্য' থেকে বিরত থাকার আদেশ দেন এবং সেই সব বইপত্র পড়তে নিষেধ করেন, যেগুলি পাঠে শিশুর মনকে বৈজ্ঞানিক চেতনায় ও যুক্তিবাদে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করে। যেহেতু যুক্তিবাদ বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ, সেহেতু এ-ধরনের শিক্ষা শিশুর বিজ্ঞানমনস্ক হবার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞান মনস্কতার মূল মন্ত্র হল যা বিশ্বাস করা হবে, তার সমর্থনে প্রমাণ হাজির করতে হবে। প্রমাণের সূত্র ধরে সিদ্ধান্তসমূহ যে কোন দিকে মোড় নিতে পারে, তাতে বিজ্ঞানের আপত্তি থাকে না। কিন্তু ধর্মীয় সত্য পূর্ব-নির্ধারিত। সেই পূর্ব-নির্ধারিত সত্যে উপনীত হওয়াই ধর্মীয় শিক্ষার মূল মন্ত্র। অন্য কোন সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সেই সিদ্ধান্তগুলির সত্যাসত্য নিয়ে প্রশ্ন করার কোন অধিকার ধর্ম সহ্য করে না।"

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আছে। বাংলাদেশের মুসলমানদের মতোই হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষেও ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষাবিভাগের ঔদার্যের প্রশংসা করতে হয় যে সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাঁরা স্ব স্ব ধর্মের পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করেছেন এবং তাদের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষায় উত্তরদান নিজ নিজ ধর্মের পাঠ্যপুস্তকের ভিত্তিতেই হয়। কিন্তু এই ভাবে কৈশোর থেকে ধর্মের মতো শক্তিশালী এবং সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শকাতর বিষয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি পরস্পর সম্পর্করহিত প্রায় ওয়াটার-টাইট (water-tight) প্রকোষ্ঠের মতো বড় হয়ে ওঠে, তবে তা কি ওদেশে অখণ্ড জাতীয়তা গড়ে তোলার সহায়ক হবে? ছাত্রাবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা যদি দিতেই হয়, তবে তা সব ধর্মবিশ্বাসের মূলে যেসব সর্ব সামান্য নৈতিকতা (ethics ও moral) তার মধ্যে সীমিত রাখা ও বহুত্ববাদী (pluralist) সমাজ গড়ার জন্য কেবল নিজ ধর্মেরই নয়, প্রচলিত অপরাপর ধর্মের মূল উপদেশগুলি সম্বন্ধে একই রকম ভাবে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে চিন্তা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়েছে।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক অধ্যাপক হায়াৎ মামুদের একটি প্রবন্ধে ওদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে বাঙালি বনাম ইসলামী অস্মিতার যে প্রবল দ্বন্দ্ব শিক্ষাজগতে চলছে তার পরিচয় পেলাম। ১১ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী পরিষদ আয়োজিত একটি সেমিনারে তিনি বাংলাদেশের বিগত একশ' বছরের শিক্ষাব্যবস্থার সমীক্ষার একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন যা ঢাকার বিশিষ্ট দৈনিক 'সংবাদ'-এ ২৪শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে মাদ্রাসা স্কুলের মোট সংখ্যা আধুনিক লিবারাল শিক্ষার স্কুলের চেয়েও বেশি। অধ্যাপক মামুদের মতে মাদ্রাসা শিক্ষা কেবল 'নন-সেকুলার'-ই নয়, তার আধুনিকতা ও গণতন্ত্র-পরিপন্থী চারিত্র ধর্ম আরও গভীরমূল : "মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য সর্বদা ধর্মীয় শাস্ত্রাদি অনুশীলনের মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে। ফলে মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে একরৈখিক regimentation মাদ্রাসাগুলোর স্বাভাবিক চরিত্রলক্ষণে পর্যবসিত হয়েছে এখানে। ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে জানি বলে প্রাসঙ্গিক একটি তথ্য উল্লেখ করতে চাই, মেধারহিত regimentation-এর বিষয়টি তাতে ভালোভাবে বোঝা যাবে। মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে liberal education বা মুক্ত জ্ঞানচর্চার পরিবেশ নেই মূলত পাঠ্যসূচির কারণে, আমরা জানি। যা জানি না তা হল, এ শিক্ষাপদ্ধতি গুরুবাদী, অন্তত আমাদের দেশে।" হায়াৎ মামুদ সাহেব তাই সঙ্গত কারণেই সমান্তরাল ও প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিক্ষা ব্যবস্থার ফসল নাগরিকদের মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি — সর্বক্ষেত্রে উত্তরোত্তর অধিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন যাতে বাংলাদেশের জাতীয় সংহতি বিপন্ন হবার আশঙ্কা। এই প্রসঙ্গে যে সমস্যাটির বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ অধ্যাপক মামুদের ছিল না তা হচ্ছে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর এর প্রভাব। প্রতিবাদের আশঙ্কা না করে বলা যায় যে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা ওদেশের সংখ্যালঘুদের আধুনিক রাষ্ট্রের সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে দেখতে চাইবে না। ইসলামে অ-মুসলমানদের জন্য যে জিম্মি-এর স্থান নির্ধারিত, তার বেশি বাংলাদেশের ঐসব ভবিষ্যৎ নাগরিকরা এগোতে চাইবেন না। এ-প্রসঙ্গে পুনরপি স্মরণে রাখা ভাল যে বাংলাদেশে আধুনিক লিবারাল শিক্ষার স্কুলের চেয়ে মাদ্রাসা স্কুলের সংখ্যা বেশি।

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে অল্পাধিক ভুল ধারণা থাকে যে তারা অপর কোন (অনেক সময়ে প্রতিবেশী) রাষ্ট্রের এজেন্ট বা তার প্রতি অনুগত কিংবা অন্তত সাংস্কৃতিক বা মানসিক আকর্ষণসম্পন্ন, কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে চমৎকার হাতিয়ার পায় স্বদেশের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে দেশের এই জনমতকে উত্তেজিত করে। অন্য রাষ্ট্রের সত্য বা কাল্পনিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে স্বদেশে যে মানুষ ক্ষ্যাপানো হয় তার স্বাভাবিক শিকার হয় সংখ্যালঘুরা। অসহায় নর-নারীগুলি কেবল হাতের কাছে রয়েছে বলে। অথচ বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদেরই ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন স্বদেশের সরকারের ক্রিয়াকলাপে হওয়া কঠিন। সুতরাং অপর দেশের সংখ্যালঘুরা কোন আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করবে — এ এক অসম্ভবপ্রায় কল্পনা। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার কোন কোন দেশের ইহুদী বা অশ্বেতকায় পীড়ন অথবা আমাদের ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের মুসলমান নিগ্রহে উত্তেজনাদানকারীরা এসব যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না। বলা বাহুল্য, সংখ্যায় অল্প হলেও সংখ্যালঘুদের প্রাণমান বিপন্নকারী মানুষের অস্তিত্ব বাংলাদেশেও আছে। ইরাক-ইরান বা ইরাক-কুয়েতের যুদ্ধে কিংবা আফগানিস্তানের এত দিনের

গৃহযুদ্ধে মুসলমান মুসলমানকে মারলে তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। অথবা বসনিয়ার মুসলমানরা খ্রিস্টানদের দ্বারা নিগৃহীত হলেও তেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। কিন্তু ভারতে মুসলমানদের প্রতি কোন অত্যাচার হলেই এক শ্রেণীর বাংলাদেশের মানুষ ত্বরিৎ স্বদেশের হিন্দুদের মনে মনে আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া করে দেন। কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গকে (বঙ্গবন্ধুর প্রতিও এই অভিযোগ উঠেছিল) অথবা সংখ্যালঘুদের প্রতি ন্যায়বিচারের প্রবক্তা বেগম সুফিয়া কামালকে ভারতের দালাল আখ্যা দেন। আর একবার মন বিরূপ হলে বাইরে তার অভিপ্রকাশ ঘটতে কতটুকু দেরী লাগে? ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের এই সমস্যা কেবল হিন্দু-মুসলমান বা বাংলাদেশ-ভারতের প্রশ্ন নয়। এর অতীত ইতিহাস আদিম মানবের 'আমরা' বনাম 'ওরা' দ্বন্দ্বে নিহিত। এর স্থায়ী সমাধান এক দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বমানবের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নির্মাণে বলে এ প্রসঙ্গের এখানেই সমাপ্তি করা হচ্ছে।

॥ ৫ ॥

অতঃপর মূল প্রশ্ন — বাংলাদেশে হিন্দুরা শেষ অবধি টিকে থাকতে পারবেন কি? কিন্তু তার পূর্বে প্রশ্নটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একটি প্রসঙ্গের প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করা দরকার। এটি ওদেশের হিন্দুদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার চালচিত্র সম্পর্কিত।

বেগম সুফিয়া কামাল জানালেন যে, হিন্দুদের ক্রমাগত বাস্তুত্যাগের অন্যতম কারণ বিবাহযোগ্যা মেয়েদের জন্য স্বদেশে সুপাত্রের অভাব। একটু শিক্ষিত ও সম্পন্ন হলেই হিন্দুরা ভারতে যাবার কথা ভাবেন, বিশেষ তথাকথিত উচ্চবর্ণের যুবকেরা। ফলে পাত্রের খোঁজে কন্যার পিতা-মাতা ও শেষ অবধি পাত্রীটিকেও বাংলাদেশ ছাড়তে হয়। এর মূলে আবার হিন্দু সমাজের জাত-পাতের বিচার। বেগম সুফিয়া কামালের মতে মুসলমান মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে এত অসুবিধে নেই। অন্যান্য জায়গার অভিজ্ঞতাতেও দেখেছি তাঁর বক্তব্যে জোর আছে। বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে যুগোপযোগী আধুনিক ধ্যান-ধারণা ও সংস্কারের প্রবর্তন হয়নি। তার জন্য সক্রিয় প্রয়াসও দৃষ্টিগোচর নয়।

নোয়াখালির গান্ধী আশ্রমের কর্মীদের অভিজ্ঞতা হল এই যে, অতীব স্বল্প সংখ্যক যেসব হিন্দুরা (নাথ, মালো বা ঋষি যাঁরা তথাকথিত উচ্চবর্ণের নন) ঐ এলাকায় আছেন, তাঁরা আশ্রমকর্মীদের প্রতি খুব প্রীত নন। কারণ, উচ্চবর্ণের হয়েও তাঁরা মুসলমানদের সঙ্গে নাকি অতিরিক্ত মাখামাখি করেন। গান্ধী আশ্রমের হেঁসেলে হিন্দু-মুসলমান বা উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ নেই এই কারণে স্থানীয় হিন্দুদের অনেকে ওখানে অন্নগ্রহণ করেন না। হিন্দু সমাজের যে বর্ণব্যবস্থার আর এক দিনও টিকে থাকা উচিত নয় এবং ভারতে যার ভিত্তিমূল বহুলাংশে শিথিল হয়েছে, বাংলাদেশে তাতে এখনও চিড় ধরেনি মনে হল। কেবল তা-ই নয়, এর প্রভাব ঐ ক্ষীয়মান হিন্দুসমাজে এত প্রবল যে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্পন্ন হলেই নিজ পদবী পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের পদবী গ্রহণ করার ঘটনা ঘটছে। কুমিল্লা ও অন্য কয়েকটি স্থানে এরকম ঘটনার কথা শুনেছি।

শুধু তাই নয়, হিন্দু সমাজের অর্ধেক নারীদের অবস্থা ওখানে শোচনীয়। ওদেশে ভারতের হিন্দু কোডের মত কোন যুগোপযোগী সমাজ সংস্কারের আইন হয়নি। এরজন্য তেমন কোন আন্দোলনও নেই, শ্রদ্ধেয়া বৌদি শ্রীমতী চিত্রা ভট্টাচার্য ও তাঁদের মত মুষ্টিমেয় নারী অধিকারের জন্য জনমত জাগ্রত করার সাধনায় রত মহিলাদের মধ্যে ছাড়া। সমাজের মাথা অধিকাংশ পুরুষের মতে (ঠিক ভারতের মুসলমান সমাজের নেতৃত্বের দাবিদার পুরুষদেরই মত) মহিলাদের সমান অধিকার দেওয়া বা জাত-পাতের অসাম্য দূর করা ইত্যাদি হিন্দু সমাজের ঘরোয়া ব্যাপার ও গৌণ প্রশ্ন। ওসবের প্রতি পরে দৃষ্টি দেওয়া যাবে। বর্তমানে মুখ্য প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের ইসলামীকরণের প্রবল জোয়ারের মুখে কিভাবে হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষা করবে তার উপায় করা। এর জন্য হিন্দুদের সংহতি ও ঐক্য রক্ষা করা একমাত্র কর্তব্য। ভারতেরই মতো ভোটের রাজনীতির মুখ চেয়ে ওদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ ও সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মৌন থাকাই অধিকতর সুবিধাজনক মনে করে।

বাংলাদেশে হিন্দু নারীরা এখনও পতির মর্জিতে যখন ইচ্ছা পরিত্যক্তা হতে পারেন, পুরুষ যতগুলি ইচ্ছা বিবাহ করতে পারে পরিত্যক্তা স্ত্রী ও তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের খোরপোষের কোন ব্যবস্থা না করেই, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে অবস্থা প্রাক্ হিন্দু কোড বিলের ভারতীয় নারীদের মতই অর্থাৎ শোচনীয় ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে অসহায় নারীর দেহ বিক্রয়ের ব্যবসায় গ্রহণ অথবা মুসলিম সমাজে আশ্রয় গ্রহণের ঘটনাও ঘটে। শোচনীয় ব্যাপার হল এই যে, বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের অতীব শ্রদ্ধেয় নেতা ভূতপূর্ব বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যের মতো জনসেবক এই প্রয়োজনীয় সমাজ সংস্কারের পক্ষে জনমত তৈরি করতে গেলে কেবল তাঁর বিরোধিতাই করা হয় না, তাঁকে দৈহিক পীড়ন করতেও উদ্যত হন একদল যুবক যাঁরা ওদেশে উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজাধারক বলে নিজেদের দাবি করেন। মনে হয়, বাংলাদেশের হিন্দুদের একাংশ একটা আত্মহত্যার মানসিকতার শিকার যার বাহ্য উপসর্গ এই আধুনিকতা ও যুক্তিবাদবিরোধী কূপমণ্ডূকতা।

১৯৪৭ খ্রি থেকে ওদেশের হিন্দু সমাজের মাথাদের দেশত্যাগপর্ব শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় সমাজের সংহতি টিকে থাকতে পারে মূলত দু'টি উপায়ে — শিক্ষা ও আর্থিক উন্নয়নের

ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা। বহু শতাব্দী প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে ইউরোপের ইহুদী সম্প্রদায় অস্তিত্ব রক্ষা করেছেন এই পদ্ধতিতে। ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক প্লাবনের সামনে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ ও ভারতের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের পিছনেও পূর্বোক্ত উপায় দু'টির বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে যে পরিমাণ মন্দির-মঠ এবং পূজা-মচ্ছবের প্রতি আকর্ষণ দেখলাম, আত্মোন্নতির জন্য আত্মবিকাশের উপরে উল্লিখিত ঐ উপায় দু'টির অনুশীলন প্রয়োগের কথা তেমন শোনা গেল না। অথচ হিন্দু সমাজের মধ্যে এখনও শিক্ষিত ও সম্পন্ন ব্যক্তিদের অভাব নেই। কিন্তু অতীতের মহেশ ভট্টাচার্য বা ঐ প্রাতঃস্মরণীয় দাতা ও জনসেবকের নাম করার মতো ছোটখাট অনুগামীর খবর পেলাম না। এক্ষেত্রে বরং বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের ভূমিকা উদ্দীপনাবর্ধক। আর প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে একই পরিস্থিতিতে পড়লেও বাংলাদেশে তাঁদের সংখ্যাহ্রাস ঘটছে না।

হিন্দু সমাজের ক্ষয়িষ্ণু রূপের অপর একটি উদাহরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। শ্রীযুক্ত টমাস কস্টা বাংলাদেশের রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'ক্যারিটাস'-এর (Caritas) বিশিষ্ট কর্মকর্তা। জয়াগের গান্ধী আশ্রমের অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার পর সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিবাদী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলাম। ঢাকাতেও তাঁদের প্রতিষ্ঠানে আতিথ্য লাভ করার সময়ে প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক কাজকর্ম সম্বন্ধে পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতাও হয়। ঐ নবীন সমাজসেবকের জ্ঞানতৃষ্ণা কিন্তু উচ্চশিক্ষান্তে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার পর শেষ হয়ে যায়নি। নিজের জেলা রাজশাহীর পরস্পর থেকে দূরে অবস্থিত দু'টি গ্রামের হিন্দু সমাজের বাস্তব অবস্থার উপর তাঁর অধ্যয়ন সদ্য শেষ করেছেন তাঁর ডক্টরেটের থিসিসের জন্য। তাঁর অভিজ্ঞতা হল গ্রাম দু'টির 'পঠি' (হিন্দুদের জাতভিত্তিক সমাজ) বেশ নিয়মিতভাবে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা অ্যামিবা-এর (Amiba) মতো বিভক্ত হবার পর পরস্পর বিচ্ছিন্ন। তবে কেবল বিচ্ছিন্ন নয়, বহু ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু। এর পরিণামে ঐ গ্রাম দু'টির হিন্দুদের আর্থিক দুর্গতি বাড়ছে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নতি হচ্ছে না। আর শেষ অবধি নিঃস্ব হয়ে অনেকে গ্রাম ও দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে কৃষি মজুর বা অদক্ষ শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছেন। প্রথম যৌবনে আনন্দবাজার পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' পড়েছিলাম। হিন্দু সমাজের আত্মঘাতী বৃত্তির এমন একটি বিচিত্র উদাহরণের কথা তাতে জেনেছিলাম যার কথা আজও মনে আছে। ওড়িশায় সেকালের ক্ষৌরকাররা মাটির ভাঁড়ে ক্ষৌরকার্যের সাজসরঞ্জাম নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেতেন। বাজারে চামড়ার সুটকেশের আবির্ভাবের পর আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন অনেকে মাটির ভাঁড়ের বদলে ছোট ছোট চামড়ার সুটকেশে ঐসব সাজসরঞ্জাম নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেতে লাগলেন। আর কিছু কালের মধ্যেই মাটির ভাঁড় নিয়ে ক্ষৌরকার্যকারী 'কণা মুটিয়া'-দের থেকে পৃথক এক জাতের হয়ে গেলেন 'চাম মুটিয়া' অর্থাৎ চামড়ার সুটকেশে সাজসরঞ্জাম বহনকারী ক্ষৌরকারেরা। আর জাতের প্রথা অনুসারে তাঁদের মধ্যে ক্রমশ সামাজিক মেলামেশা ও লেনদেন বন্ধ হয়ে গেল।

॥ ৬ ॥

আজকের দিনে যত দূর ভবিষ্যতের কথা অনুমান করা সম্ভব, বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ অল্পাধিক অব্যাহত থাকলেও তাঁদের দেশত্যাগ ব্যাপক হবে না। হবে না নিছক বাস্তব কারণেই। ভারতের আর্থিক বিকাশের গতি বাংলাদেশের থেকে বলশালী হলেও এমন নয় যে ওদেশের সব হিন্দুদের (সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব না হলেও এখনও দেড় কোটির কম নয়) সাদরে আশ্রয় দিতে পারে। ভারতের বিগত সাতচল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে মাঝেমধ্যে হিন্দু অস্মিতা নিয়ে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও (ইজরাইলের ইহুদী বা ব্যতিক্রম স্বরূপ আর কোন কোন উদাহরণের মতো) তা এমন বলশালী নয় যে বাংলাদেশের তাবৎ হিন্দুদের ভারতবাসী দুই হাত বাড়িয়ে সাদরে গ্রহণ করবে। আসাম, পূর্বোত্তরের অন্য রাজ্যগুলি বা বিহারের মতো বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ, যেখানে স্বাভাবিক ভাবে ওদেশের হিন্দুরা শরণ নেন, সেখানে তাঁদের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধি স্থানীয় অধিবাসীদের কাম্য নয়। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বা সরকারের কাছেও বাংলাদেশের হিন্দুদের ব্যাপক আগমন উৎসাহের কারণ হবে না। অতীতে বাংলাদেশের বহু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই পাননি এবং তাঁদের মধ্যে ছোট একটা দল (হাজার দশেক) অন্য রাজ্যে অসুবিধায় পড়েই হোক অথবা ভ্রান্ত প্রচারের শিকার হয়ে নিজেদের উদ্যোগে মরিচঝাঁপির মত অনগ্রসর এলাকায় বসতি স্থাপন করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার কীভাবে তাঁদের লাঠিপেটা করে বিদায় করে ও পশ্চিমবঙ্গবাসী বাংলাদেশের হিন্দু দরদীরা তার অসহায় দর্শক ছিলেন, তার দৃষ্টান্তও আমাদের সামনে আছে। সুতরাং ভেবেচিন্তে, বুঝেসুঝে বাংলাদেশের হিন্দুরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করবেন বলে মনে হয় না।

আর এরকম করার কারণও নেই। এদেশে হিন্দু বা যে কোন সংখ্যালঘুবিরোধী (এমন কি শিয়া ও আহমদীয়াদের মতো মুসলিম সংখ্যালঘুদেরও বিরোধী) ইসলামী মৌলবাদীদের একটা ক্ষুদ্র অথচ মুখর শ্রেণী সক্রিয় আছে ঠিকই। কিন্তু তাই বলে হিন্দুদের প্রতি সদিচ্ছাপরায়ণ ও তাঁদের এক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিকের মর্যাদা দিতে আগ্রহশীল একাংশ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক বাংলাদেশের নাগরিকদের 'মৌন

সংখ্যাগরিষ্ঠদের' (silent majority) সক্রিয় অস্তিত্ব কোন কবি-কল্পনা নয়। বাংলাদেশের হিন্দুদের অস্তিরক্ষা ও ভবিষ্যতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্যারান্টি ঐ 'মৌন সংখ্যাগরিষ্ঠ' ও তাঁদের মুখর সংখ্যালঘু অংশ। বলা বাহুল্য, প্রথম গ্যারান্টি হল বাংলাদেশের হিন্দুদের আত্মশক্তি।

'মৌন সংখ্যাগুরুদের' মুখর অংশ মোট জনসংখ্যার তুলনায় মাথা গুনতিতে কম হলেও প্রভাবে মোটেই ন্যূন নন। মাতৃসমা কবি বেগম সুফিয়া কামাল (অংশত নিরাপত্তার অভাববোধ ও অংশত স্বদেশবাসীর কাছে ১৯৯০-৯২ খ্রিস্টাব্দের হিন্দু পীড়নের শতবিধ ঘটনার নৈতিক প্রতিবাদে ১৪০০ সনের দুর্গাপূজা বহু স্থলে বন্ধ রাখা ও বহু স্থলে কেবল ঘটস্থাপনা করে সারার সময়ে ঢাকায় তাঁর হিন্দুদের প্রতি প্রবল সহমর্মিতা প্রকাশ ও তাঁদের সাহস দেবার জন্য পূজার উদ্যোগ-আয়োজন ও বিজয়া-সম্মিলনীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হবার সাম্প্রতিক ক্লাসিক উদাহরণ), ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, ডঃ আহমদ শরীফ (এঁর প্রবল ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিকার জন্যও মৌলবাদীরা 'গর্দান চাই' হুঙ্কার ছাড়ে), শওকত ওসমান, ডঃ খান সারওয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, কবি শামসুর রাহমান, রেডিও বাংলাদেশের 'চরমপত্র' খ্যাত বিশিষ্ট লেখক এম আর আখতার মুকুল (চট্টগ্রামের দাঙ্গার খবর পেয়ে বন্ধুদের সহ ছুটে যাওয়া), লেখক-সম্পাদক মীজানুর রহমান, কবি বেলাল চৌধুরী, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট-এর ফয়েজ আহমদ, অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান, নতুন প্রজন্মের সাহসিকা তসলিমা নাসরিন — এই ভাবনায় ভাবিত ও কর্মরত যে বহু সংখ্যক সুধীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম। বিচারপতি কামালউদ্দীন হোসেন, ডঃ আনিসুজ্জামান, বদরুদ্দীন উমর এবং তাঁদের মত আরও অনেক বুদ্ধিজীবি ও কর্মী যাঁরা ওদেশের সর্বত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের জন্য স্ব স্ব ক্ষেত্রে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য না হলেও তাঁদের কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে। শুভার্থী ও সহায়দের এত বড় সম্পদের ভাণ্ডারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা ওদেশে হিন্দুদের পক্ষে আত্মঘাতী হবে।

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার এই মানসিকতা কেবল ব্যক্তির মধ্যে সীমিত নেই। ব্যাপক জনমত তৈরি করার সাধন গণমাধ্যমগুলির মধ্যেও তা ক্রিয়াশীল। ওদেশের এ-জাতীয় পত্র-পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ সূচি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না এবং আমি ভালভাবেই জানি যে বহু উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার নাম বাদ পড়ে যাচ্ছে। তবু কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি। দৈনিকের মধ্যে সংবাদ, জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ এবং এছাড়া সাপ্তাহিক ঢাকা, সুগন্ধা, মীজানুর রহমানের পত্রিকা ইত্যাদি।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ১৯৯০-৯২ খ্রি বাবরি মসজিদ আক্রান্ত ও ভঙ্গ হবার পর বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর একতরফা আক্রমণ, লুটপাট ও অত্যাচারের যেসব বহুবিধ ঘটনা ঘটে, তাতে বহু দিনের প্রতিবেশী পরিচিতরাও যুক্ত ছিল। স্বভাবতই এর ফলে হিন্দুদের মনে প্রতিবেশীদের উপর বিশ্বাস চলে যায় ও বাংলাদেশে তাঁদের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রবল আবেগ ও উত্তেজনার পরিবেশ — ধর্মীয় উন্মাদনার জন্য যখন মানুষ প্রায় উন্মাদ তার ভিতরও বাংলাদেশের মুসলমানদের ভিতর মনুষ্যত্বের, প্রতিবেশীসুলভ ব্যবহার যাতে উৎপীড়িতদের মধ্যে আবার আস্থা ফিরে আসে — এরকম ঘটনার সংখ্যাও অজস্র। সংবাদের প্রচলিত সংজ্ঞা — কুকুর মানুষকে কামড়ালে সংবাদ হয় না, হয় মানুষ কুকুরকে কামড়ালে — অনুযায়ী দুর্ভাগ্যক্রমে মনুষ্যত্বের বিকারের ঘটনাসমূহই সংবাদ-মাধ্যমগুলির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। মানবতার অভিব্যক্তির ঘটনাবলি তেমন গুরুত্ব সহকারে প্রচার-মাধ্যমগুলিতে স্থান পায় না। তবু 'গ্লানী'-এর মতো মূলত সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাতে হিন্দুদের নিপীড়িত হবার দলিলেও এমন বেশ কয়েকটি উদাহরণ আছে যেখানে আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাকশাল এবং এমনকি বি এন পি-এর মুসলমান কর্মীরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে একক ও সম্মিলিতভাবে স্ব-সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে হিন্দুদের ধন-প্রাণ রক্ষা করেছেন। চট্টগ্রামের প্রবর্তক আশ্রমের কর্মী শ্রী ননীগোপাল দে-এর কাছে তাঁদের স্বগ্রামের (শহর থেকে প্রায় ২৫ কি.মি. দূরে হিন্দু-অধ্যুষিত পাঁচ-ছয়টি গ্রামের অন্যতম) এমনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পাবার ঘটনার কথা শুনলাম। নোয়াখালির জয়াগের গান্ধী আশ্রম ও চৌমহনী রামঠাকুরের সমাধি-মন্দির ও আশ্রমে গিয়েও কর্মীদের কাছে শুনেছি যে প্রশাসনের জাগরূকতা ও স্থানীয় জনসমর্থনের জন্য ঐ সময়ের অত উত্তেজনার মধ্যেও কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। নোয়াখালি, কুমিল্লা ও ঢাকা প্রমুখ যেসব এলাকায় গেছি, সেখানেই এরকম একাধিক ঘটনার কথা শুনেছি, যা কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। পরিসংখ্যান দিয়ে আমার পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব হবে না, তবে সব দেখে শুনে আমার মনে হয়েছে যে বাবরি মসজিদ সম্পর্কিত হিন্দু পীড়নের যত ঘটনা সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘটেছে, হিন্দুদের রক্ষা ও সাহায্য-সহযোগিতা করার ঘটনা তার থেকে বেশি।

বাংলাদেশে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের সম্পর্কে মনোভাবের একটি উদাহরণের উল্লেখ করে এ-প্রসঙ্গের ইতি করব। ঘটনার বিবরণ বন্ধুবর আখতার মুকুল সাহেবের কাছে শোনা। কয়েক বছর পূর্বে এরশাদ আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

হিন্দু ছাত্রদের আবাস জগন্নাথ হলে ছাদ ভেঙ্গে পড়ে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে। বেশ কিছু ছাত্র নিহত হয় এবং অনেক ছাত্র মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রচুর পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন ঘটায় সংবাদপত্র, বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে অবিলম্বে রক্তদানের জন্য ব্যাপক আহ্বান জানানো হয়। জনসাধারণও বিপুলভাবে সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে এত রক্তদান করেন যে শেষ অবধি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বহু রক্তদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতে হয়। রক্তদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের এক লম্বা লাইনে আরও অনেকের সঙ্গে মুকুলসাহেবও অপেক্ষা করছিলেন নিজের পালা আসার জন্য। তাঁর সামনে ছিলেন এক রিকসাওয়ালা, রক্তদানের জন্য তাড়াহুড়া করে চলে আসার ফলে যাঁর পক্ষে রিকসাটিকে কোথাও রেখে আসা সম্ভব হয়নি। রিকসার সঙ্গে সঙ্গে তার মালিকও এগোচ্ছেন ধীরে ধীরে রক্তদান কেন্দ্রে। পিছনে পিছনে মুকুল সাহেব। সময় কাটাবার জন্য মুকুলসাহেব সেই রিকসাওয়ালার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। তাঁর মনের ভাবের আঁচ পাবার উদ্দেশ্যে মুকুলসাহেব তাঁর বিখ্যাত 'চরমপত্র'-এর ঢাকাই কুট্টির ভাষায় বললেন যে, আহত ছাত্রগুলি হিন্দু একথা মিঞাসাহেব জানেন কিনা? হ্যাঁ উত্তর পাবার পর আবার বলেন যে, হিন্দু যখন তখন তো এদেশে থাকবে না। তাহলে তাদের জন্য রক্ত দিয়ে লাভ কি? রিকসাওয়ালা গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন, 'যাওনিয়ারা গেছে গিয়া। হেইগুলি আমাগো।' অর্থাৎ যারা যাবার তারা চলে গেছে, আহত ওরা আমাদেরই।

॥ ৭ ॥

বাংলাদেশের দেড় কোটির মত হিন্দুদের অধিকাংশকে ওদেশে থাকতে হবে এবং তাঁরা থাকবেন ধরে নিয়ে তাঁদের থাকার ও ভালভাবে থাকার সহায়ক কয়েকটি পন্থার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথমে এক দরদী ব্যক্তি হাসান ফেরদৌসের বক্তব্যের উদ্ধৃতি যা 'সাম্প্রদায়িকতা : বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে' শীর্ষকে ১৯৯১ খ্রি ২৮শে ফেব্রুয়ারির সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল :

"সমাজের ভেতরে সর্বদা একাধিক শক্তি তৎপর থাকে। সংখ্যায় যতই লঘু হোক, এদের একাংশ চিরকালই মূল স্রোতধারাকে অগ্রাহ্য করার বা তার উপর নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। সামাজিক অসাম্য ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে বিবেকের ধ্বনি হিসাবে তারা কাজ করে থাকে। বাংলাদেশে এক সময়ে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ নৈতিকভাবে অধিক বলশালী এবং সামাজিক শক্তি হিসেবে কেবল তৎপরই ছিল না। সামাজিক গতিধারা নির্ণয়ে স্টিয়ারিং হুইলের মতো কাজও করেছে। আজকের বাংলাদেশে নৈতিকভাবে বলশালী এই স্টিয়ারিং হুইলটি কার্যত অনুপস্থিত। তারা যে স্থবির বা খণ্ডকালীন নিদ্রায় মগ্ন তা নয়, এদের অধিকাংশই সংখ্যাগুরুর মুল স্রোতধারার সাথে কার্যত অঙ্গীভূত হয়েছে। সংখ্যাগুরুর বাহ্যিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই যে তা ন্যায়সঙ্গত নয়, এই সত্যটি তারা অনেকেই ভুলে যান এবং প্রায়শ তার সাথে ঐকামত পোষণ করেন। সংখ্যালঘুদের প্রশ্নটি তার একটি উদাহরণ। প্রতিবাদ যে ওঠেনি তা নয়, তবে প্রতিরোধের চেষ্টা যে বড়ই বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল। দেশ স্বাধীন হবার দুই যুগ পরে সংখ্যালঘুদের প্রতি ক্রমবর্ধমান বৈষম্য তার প্রমাণ।

"এই ঘুমিয়ে থাকা, জং ধরা স্টিয়ারিং হুইলটিকে আবার জাগাতে হবে, তাকে শাফ সুতরো করতে হবে। একথা উপলব্ধি করতে হবে, প্রতিবাদ না করার অর্থ মেনে নেয়া। শুধু তাই নয়, অন্যায় ও অসমতার সঙ্গে তা সন্ধি করার সমার্থক।

"সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে হবে। সম্ভব হলে দেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সাথে আঁতাত গড়ে তুলতে হবে। ... বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে তাদের বিচ্ছিন্নতার জন্যে নিজেরাও খানিকটা দায়ী নয়, তা বলা যাবে না। এর পেছনের কার্যকারণটি অবশ্য বোঝা কঠিন নয়, তবে তারা যে মূল স্রোতধারার সাথে স্পষ্ট অর্থে অন্বিত হতে যথেষ্ট চেষ্টা করে না — বরং আগেভাগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে — তা অনেকেই সত্য বলে মানবেন।"

পূর্বোদ্ধৃতিতে যে হাল ছেড়ে দেবার কথা বলা হয়েছে তার অভিব্যক্তি ঘটে দ্বিবিধ ভাবে। এর প্রাথমিক ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল সংখ্যালঘুবাদ যা হতাশার একটা পর্যায়ে এসে উগ্রবাদ বা সন্ত্রাসবাদ রূপেও ফেটে পড়ে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'হিন্দু ফাউন্ডেশন', 'জাতীয় হিন্দু পরিষদ' বা তার মতো জঙ্গী হিন্দু প্রতিষ্ঠান অথবা তার একাঙ্গী কর্মসূচি কিংবা এমন কি অপেক্ষাকৃত ব্যাপকতর ভিত্তির প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ' খুব সহায়ক হতে পারবে না। সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রবর্তন অথবা প্রশাসন ব্যবস্থার কাছে ন্যায়বিচার বা মানবাধিকার সম্মত ব্যবহার পাওয়া গণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশের হিন্দু-সহ তাবৎ সংখ্যালঘুদের তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মূল ধারার অঙ্গীভূত হতে হবে। জাতীয় দলগুলির মধ্যে কোন এক বা একাধিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য সংখ্যাগুরুদের মধ্যে এর অনুকূল রাজনৈতিক শিক্ষার প্রচারে ব্রতী হতে হবে। সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও কর্মসূচি সংখ্যাগুরুদের মতো সংখ্যালঘুদের পক্ষেও সমান আত্মঘাতী।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক পক্ষপাত বা দুর্নীতি, সামাজিক ক্ষেত্রে বলশালীর সম্পত্তি বা অর্থলালসা কিংবা অসামাজিক ব্যক্তিদের

দ্বারা নারী নিগ্রহের ঘটনায় পীড়িত হয়ে যেসব হিন্দু দেশত্যাগে এর সমাধান খোঁজেন, তাঁদের দু'টি সত্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। প্রথমত, পূর্বোক্ত অন্যায় অবিচার অথবা শোষণে ওদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মতো সংখ্যাগুরুরাও পীড়িত। সাধারণ নাগরিক ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে একথা জানা ছাড়াও পেশাগত কারণে যাঁদের এইসব ঘটনা নিয়ে নাড়া-ঘাঁটা করতে হয়, সেই পুলিশের কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের কাছ থেকেও এই মর্মে জেনেছি। বলা বাহুল্য, ঐসব পুলিশ ও আইনজীবীরা হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। আর এইটাই খুব স্বাভাবিক। কারণ আধুনিক রাষ্ট্রের চরিত্রই শোষণ-শাসনধর্মী। দ্বিতীয় সত্যটি হল এই যে দেশত্যাগ করে যে ভারতে আসার কথা তাঁরা ভাবেন সেখানে হিন্দু সরকারী কর্মচারী, পঞ্চায়েতের প্রধান, ধনী ও মহাজন কিংবা মস্তান অথবা নারীদেহ-লোলুপ বিকৃত কামনার ব্যক্তি কর্তৃক হিন্দু পুরুষ-নারীদের রাজনৈতিক আর্থিক-সামাজিক বা যৌন শোষণ হয় না — এমন কথা নয়। সুতরাং দেশত্যাগ কোন সমস্যার সমাধান নয়। প্রয়োজন স্বদেশে থেকে সসম্মানে বাঁচার অধিকারের জন্য লড়াই করার মানসিকতা গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের হিন্দু অথবা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সমস্যা আমার মতে ধর্মীয় নয়, ব্যাপকতর মানবাধিকারের সমস্যার স্থানীয় রূপ। আরও তলিয়ে বিচার করলে এর মূল সুদূর অতীতে আদিম মানবের মানসিকতায় নিহিত। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা একে 'আমরা' বনাম 'ওরা'-এর বিবাদ বলেন। গাত্রবর্ণ, নরগোষ্ঠী (ethric). ভাষার পার্থক্য থেকে শুরু করে একালের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্নতার জন্য গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যে দ্বন্দ্ব হয় তা ধর্মকে কেন্দ্র করে বিরোধেরই সমশ্রেণীভুক্ত। এই 'আমরা' বনাম 'ওরা'-এর মানসিকতা কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী- বলয়ের মধ্যেও শেষ হয়ে যায় না, এর প্রমাণ হল হিন্দুদের মধ্যে অতীতের শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব ও বর্তমানের উচ্চ বনাম নিম্নবর্ণ, খ্রিস্টানদের ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট-প্রেসাবিট্যারিয়ান অথবা মুসলমানদের সুন্নী-শিয়া-আহমদিয়া প্রমুখ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অস্মিতাকে খুঁজে পাবার মানুষের এই সুপ্রাচীন ব্যাধির চিকিৎসা আধুনিকতা ও বিজ্ঞানরূপী ভূমার সঙ্গে পরিচয়ে। নাল্পে সুখমস্তি।

স্বদেশে থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্ব-সম্প্রদায়ের মানবাধিকারের জন্য লড়াই করার উদাহরণ হিসাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের দীর্ঘকালীন আন্দোলন ও ঐ জাতীয় আরও কিছু কিছু আন্দোলন বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তুলনীয় নয় এমন অভিমত কেউ কেউ যুক্ত করতে পারেন। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে ওসব দেশে মোটামুটি একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো ও সংস্কৃতি আছে বলে ওরকম লড়াই লড়া সম্ভব হয়েছে। জবাবে, নাৎসী জার্মানিতে ইহুদীদের অথবা বর্ণবৈষম্যপীড়িত দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধিকারের আন্দোলনের উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশ তো স্বর্গরাজ্য। বলা বাহুল্য, স্বদেশ না ছেড়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমানাধিকারের জন্য আন্দোলনের আরও বহু উদাহরণ আছে। স্বেচ্ছায় মরে বাঁচার জন্য চেষ্টা করার এই প্রক্রিয়া আত্মশক্তির উদ্বোধনের নিদর্শন। একবার এই সিদ্ধান্ত নিলে এর উপায় স্বতঃই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আত্মশক্তির উদ্বোধনের এই প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত সৌভাগ্যক্রমে এবারে কারও কারও কাছে পেলাম। তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনখ্যাত শহরের প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় নেতা বিনোদ চৌধুরী মহাশয় অন্যতম। এই সঙ্কল্পের শক্তি এদেশের হিন্দুদের ভয় ও আশাহীনতার পরিবেশমুক্ত করে জীয়নকাঠির সন্ধান দেবে।

শ্রদ্ধেয় দেবেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ অভিমত এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাংলাদেশের হিন্দুদের সংঘর্ষের পথ নেওয়া ক্ষতিকারক হবে। চাই সহযোগিতা যাতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। একক চেষ্টায় হিন্দুদের সমস্যার সমাধান হবে না। মুসলমানদের উদার গণতান্ত্রিক অংশের শুভেচ্ছা অর্জন করে তাঁদের সঙ্গে যৌথ ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। দেবেশবাবুর মতে এ-ব্যাপারে ভারতেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। উভয় দেশের মধ্যে সম্ভাবনার সেতু গড়ার জন্য ভারতকে বাংলাদেশে শিক্ষা ও শিল্প বিস্তারে পুঁজি বিনিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার অংশ দিতে হবে। এইভাবে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা গড়ে উঠবে যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথ তৈরি করবে। 'সার্ক' (SARC) সংগঠন এর একটা পথ প্রদর্শন করেছে এবং আমার বাংলাদেশে থাকাকালীন ঢাকায় 'সার্ক' অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বাণিজ্য প্রতিনিধিদের যে সভা হয় তাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে ইউরোপীয় কমন মার্কেটের অনুকরণে পারস্পরিক বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়া হবে।

সর্বশেষে উল্লেখ করলেও ভারত-বাংলাদেশের সরকারদের পারস্পরিক সম্পর্কেরও বাংলাদেশের (এবং ভারতেরও) হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের পক্ষে স্বস্তিমূলক। উভয় দেশের সরকারদের মধ্যে বিরোধের যেসব ঐতিহাসিক, সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক কারণ বিদ্যমান, বর্তমানে তার মধ্যে প্রবলতম হল গঙ্গার জলবণ্টন সমস্যা। 'কিউসেক'-এর কচকচি যদি বিশেষজ্ঞদের জন্য মুলতুবী রাখা যায়, তাহলেও এই সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে আন্তর্জাতিক নদী বলে গঙ্গার জলের বণ্টন সম্বন্ধে একতরফা সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার কারও নেই। নদীনিয়ন্ত্রণের ভ্রান্ত বুদ্ধি চালিত হয়ে গঙ্গার বুকে স্বাধীনতার পর ফারাক্কা-সহ একাধিক ব্যারাজ-বাঁধ হয়েছে, বেশ কয়েকটি বড় বড় সেতু হয়েছে যার বিশালায়তন থামগুলিও স্বাভাবিক জলধারার

গতি ব্যাহত করছে। এর নীট পরিণাম নিম্ন গঙ্গায় জলের স্বল্পতা এবং উপরিভাগে পলি জমে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি। বলা বাহুলা, গঙ্গা নিয়ন্ত্রণের এইসব পরিকল্পনার ভুক্তভোগী বাংলাদেশও। তাই এই নদীর জলবন্টন নিয়ে তার মাথাব্যথা স্বাভাবিক। জলের প্রশ্নে ভারতের ভিতরেই (তেহরি ও নর্মদার বাঁধ এবং কাবেরীর জলবণ্টন ইত্যাদি) যে বিস্ফোরক স্থিতি তাও আমরা দেখছি। সুতরাং ফারাক্কার প্রশ্নে বাংলাদেশের উত্তেজনা ও আবেগও আমাদের বোঝা উচিত এবং এর সমাধানও খুঁজে বার করা দরকার। বেগম সুফিয়া কামাল অত্যন্ত বিষণ্ন কণ্ঠে বলেছিলেন যে, এ নিয়ে এ-যাবত একাশি বার উভয় রাষ্ট্রের নেতা ও পদস্থ আমলাদের মধ্যে ঢাকা-দিল্লীতে আলাপ-আলোচনা হল, তাঁদের বিদেশ সফর ও খানা-পিনাও হল, কিন্তু এতদিনেও কোন সমাধানসূত্র আবিষ্কৃত হল না। আর এই বিরোধের জের টেনে উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য এখনও স্বাভাবিক হল না, যার ফল ভোগ করছে দুই দেশের সাধারণ মানুষ। শ্রদ্ধেয়া কবির খেদোক্তিতে উভয় দেশের পারস্পরিক সম্বন্ধের উন্নয়নকামী অসংখ্য মানুষের অসহায়তা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। আর তার মর্মবেদনার ভিতর মর্মান্তিক সত্যও নিহিত।

॥৮॥

এবার বাংলাদেশের মধ্যবিত্তদের হাল-হকিকৎ-এর প্রসঙ্গ।

ওদেশে একটি শ্রেণীর সম্পদ যেমন চোখে পড়ার মতো, অপর একটি অংশের দারিদ্র্যও তেমনি দৃষ্টিকটুভাবে প্রকট। এই অসাম্য ভারতেও আছে, প্রচণ্ড রকমে আছে। তবে সম্ভবত বৃহদায়তন দেশ বলে অতটা চোখে পড়ে না। তবে ভারতের মধ্যবিত্তরা তাঁদের বাংলাদেশের তুলনীয় পেশার মানুষদের মতো অতটা সম্পন্ন নন। ভারতের মাইনে বা রোজগার অপেক্ষাকৃত ভাবে কম। অবশ্য জিনিসপত্রের দামও তুলনামূলক ভাবে কম। কিন্তু যদি বাড়ি, গাড়ি, ফ্রিজ, ভি সি আর, রঙীন টিভি ইত্যাদি সম্পন্নদের মর্যাদার প্রতীক ভোগ্য উপকরণের মাপদণ্ডে বিচার করা যায় তাহলে মনে হবে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তরা অধিকতর সম্পন্ন। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ পেশার মধ্যবিত্তদের তুলনায় তো বটেই। অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞের কাছে গ্রাহ্য হবে এমন তথ্য আমি দিতে পারব না। তবে সাদা চোখে বুঝেছি দারিদ্র্যও ওখানে বেশি। আমি যে কথা বলতে চাই তা হল — ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ভারতের অনেক এলাকার তুলনায় বাংলাদেশে বেশি মনে হয়েছে। আর ভারতের মতোই পুঁজিবাদী বা তার আধুনিক রূপ উপভোক্তাবাদী (consumerist) মানসিকতার বৈশিষ্ট্য — আরও আরও উপভোগ্য বস্তু পাবার জন্য সদা ব্যস্ত থাকার জন্য সমাজের সম্পন্ন অংশের দরিদ্রদের প্রতি দৃষ্টি নেই। এখানে অপর একটি বিতর্কমূলক ধারণা ব্যক্ত করতে হচ্ছে যা প্রমাণ করার উপযুক্ত তথ্য দিতে পারব না। তাহল সীমিত অভিজ্ঞতাতে মনে হল — পিছিয়ে পড়া মানুষদের প্রতি ঔদাসীন্য ওখানে যেন একটু বেশি।

এর কারণ কি হতে পারে চিন্তা করেছি এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তাও বিতর্কমূলক। আমার মনে হয়েছে ওখানকার সমাজের সনাতন ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে যে ধর্মীয় অস্মিতা যুক্ত করা হয়েছে তার ফলে সমাজে আধুনিক মানসিকতা গড়ে ওঠা ব্যাহত। আধুনিকতার মূল কথা হল সামাজিক উত্তরদায়িত্ব এবং কোন না কোন ধরনের সমাজবাদী আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হওয়া। ইসলামের নির্দেশ জাকাত ব্যবস্থার জন্য বাধ্যতামূলক দান নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে মানুষে করেন। ধর্মীয় খাতে সরকারের অনুদানও আছে। আরব রাষ্ট্র থেকেও ধর্মের নামে দান আসে। কিন্তু তার অধিকাংশই ব্যয় হয় মসজিদ নির্মাণ, সংস্কার, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশন এবং ধর্মীয় উরস-মহফিলের খাতে। দরিদ্র স্বদেশবাসীর দারিদ্র নিবারণ ও শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিসেবার জন্য তার সদ্ব্যবহার তেমন হয় বলে মনে হল না। এমনকি পবিত্র বলে বিবেচিত রমজান মাসে গাড়ির আরোহী সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে সামান্য ভিক্ষা চেয়ে ব্যর্থমনোরথ হবার অনেক দৃষ্টান্ত চোখে পড়েছে। বলা বাহুলা, ভিক্ষা দেওয়া সমস্যার সমাধান নয়। কিন্তু অংশত এটা একটা বিশিষ্ট মানসিকতার প্রতীক যার পিছনে আছে দুর্ভাগাদের প্রতি ব্যক্তিগত দরদ, সহমর্মিতা। ধর্ম যদি ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র ও মানবতার অনুশীলনের উপর কেন্দ্রিত না হয়ে আচার-অনুষ্ঠানপ্রধান ও সংগঠিত বাহ্য প্রতীককে শক্তিশালী করার উপর বেশি জোর দেয়, তাহলে মনুষ্যত্বের কুণ্ঠিত হওয়া আটকানো যায় না।

বন্ধুবর আখতার মুকুলসাহেব একাধিক স্থলে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিদের বিরূপ সমালোচনা করেছেন তাঁদের একাংশের মধ্যে ভোগ্য উপকরণসমূহের প্রতি আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ দেখে। বাড়ি, গাড়ি ও বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদির প্রতি এঁদের লাগামছাড়া লোভ বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান সন্তুষ্ট করতে পারেননি বলে এঁরা তাঁর বিরোধী হয়ে পড়েন। মুকুলসাহেবের অভিমত হল এই যে সমাজের এইসব মুখর অংশ তাঁদের অসন্তোষকে লেখনী ও ভাষার প্রতি নিয়ত প্রচার করে শেখসাহেবের বিরুদ্ধে জনমত গড়ার ব্যাপারে একটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। আর এর পরিণামে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের চারটি স্তম্ভের অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের উপর প্রবল প্রহার পড়ে এবং যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তির উপর বাংলাদেশের সৃষ্টি তা-ই আক্রান্ত। প্রশ্নটা খোলাখুলি তাঁর সামনে রাখতে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ রসিকতার সঙ্গে বললেন, "দেখুন — প্রথমে আমরা হিন্দুদের তাড়িয়ে তাদের সম্পত্তি গ্রাস করেছি। তারপর 'বিহারীদের' কোণঠাসা করে তাদের সব কিছু লুটে-পুটে নিয়েছি। আর এখন দুর্নীতির সাহায্যে বাদবাকি দেশবাসীকে

চুষছি।" ইতিপূর্বে বাংলাদেশের তরুণতর প্রজন্মের লেখক আহমদ ছফা সাহেবের 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' (তৃতীয় সং) বইটিতে পড়েছি যে লেখক কেবল পাকিস্তান আমলেই নয়, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতে প্রবাসী এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর (১৯৭২) বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব বৃত্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

একজন অতীব উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী যাঁর জ্ঞান ও জনদরদী রূপের পরিচয় পেয়ে আমি তাঁর গুণগ্রাহী, প্রশ্নটি শুনে বিষণ্ন আবেগের কণ্ঠে বললেন, "স্বাধীনতার পর থেকে এ-যাবত বাংলাদেশে বছরে গড়ে দুই বিলিয়ন ডলারের মতো বিদেশি সাহায্য এসেছে। পরিমাণে এটা যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য দেওয়া মার্শাল এডের চেয়েও বেশি। কিন্তু এই পরিমাণ পড়ে পাওয়া অনার্জিত অর্থ আমাদের আর্থিক পুনর্গঠনের বদলে চরিত্র নষ্ট করছে। আর এই সর্বনাশের প্রক্রিয়ায় স্বভাবতই রাজনীতি, প্রশাসন এবং সমাজের অন্য ক্ষেত্রের মধ্যবিত্তদের বড় ভূমিকা আছে। ওদেশের অর্থব্যবস্থার হালচাল সম্বন্ধে জানেন এমন এক অর্থনীতি ও বাণিজ্য শাস্ত্রবেত্তা বললেন যে বিদেশের দান ও ঋণের দৌলতে আমরা টিকে আছি। জাতীয় স্বয়ম্ভরতার কোন চেষ্টা নেই নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। বরং শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আমদানীকারক ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। একটি উদাহরণ নিন। যে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে একদা দুধের স্রোত বইত সেখানে এখন বিদেশি গুঁড়া দুধ না এলে রোগীরাও পথ্য পাবে না। এদেশে পশুপালনের বিকাশ ঘটিয়ে গুঁড়া দুধের আমদানী বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলুন — দুধের আমদানীকারী ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের একজন প্রধান অধ্যাপক যিনি সমাজসেবার প্রত্যক্ষ কাজের সঙ্গেও যুক্ত লোভচালিত মধ্যবিত্তদের ভূমিকা সম্বন্ধে একই কথা বললেন। উপরন্তু হিসাবে যোগ করলেন যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার ও বজায় রাখার জন্য নেতারা পরিকল্পিতভাবে ছাত্রদের মস্তানবাহিনীতে পরিণত করছেন। এর ফলে পরীক্ষা-পরিদর্শককে হত্যা করার মতো দুষ্কৃতির অনুষ্ঠান করেও তারা পার পেয়ে যাচ্ছে।

আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে আশাবাদী। কারণ সমস্যার স্বরূপ ওদেশের চিন্তকাগ্রগণ্যদের কাছে ধরা পড়েছে। এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। আশা করা অন্যায় নয় যে অতঃপর তা কার্যান্বিত করার ব্যবস্থাও হবে। সমস্যাটি নিয়ে ভাবনা-চিন্তার একটি প্রেরণাদায়ী উদাহরণ পেলাম বাংলা একাডেমীতে ১৯৯৪ খ্রি অমর একুশে বক্তৃতায় (১৭ই ফেব্রুয়ারি) ওদেশের বিশিষ্ট মনীষী মোহম্মদ আনিসুর রহমানের বক্তব্যে, তাঁর সমস্ত বক্তৃতাটিই কেবল বাংলাদেশে বা অতীতের ভারতবর্ষের অপর দু'টি অংশ ভারত ও পাকিস্তানে নয়, সমগ্র উন্নয়নকামী দেশে স্বদেশের মঙ্গলকামনায় চিন্তা ও কর্মরত প্রতিটি নরনারীর বারবার অনুধাবনযোগ্য। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মধ্যমিত্তদের সঙ্গে দেশের খেটে খাওয়া মানুষদের মাধ্যমে মধ্যবিত্তদের সঙ্গে দেশের খেটে খাওয়া মানুষদের আত্মিক যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। অতঃপর উন্নয়নের নামে বিদেশি দান নিয়ে আত্মশক্তি জাগরণের সেই ঐতিহ্যকে নষ্ট করে মধ্যবিত্তরা আজ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। বাংলাদেশও বিদেশি সাহায্যের ফাঁদে পড়া অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো যার মর্মস্পর্শী চিত্রণ করেছেন আনিসুর রহমান সাহেব এইভাবে : " 'উন্নয়ন সাহায্যে'র নামে এ সমস্ত দেশে গত তিন দশক ধরে প্রচুর বিদেশী সম্পদ এসেছে, কিন্তু উন্নয়ন বলে তেমন কিছু কৃতিত্ব খুব কম দেশই দেখাতে পারছে। একদিকে সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ বিশ্বে চরম গণদারিদ্র অব্যাহত রয়েছে, কোনো কোনো দেশে বেড়েছে। আর এক দিকে যে ঘটনাটি ঘটেছে তা হল বৈষম্য বৃদ্ধি, তার ফলে এদের প্রায় সব দেশেই একটি উচ্চ থেকে উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে যাদের ভোগবিলাস দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, উপরন্তু আমদানি-নির্ভর। এই ভোগবিলাসের দৃষ্টান্তে দেশের সার্বিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোগ-মানসিকতাও 'ওপর'মুখী ও আমদানিমুখী হয়েছে এবং সাধারণ জনগণের জীবন থেকে মধ্যবিত্ত জীবন ক্রমশ দূরে সরে এসেছে। এইভাবে উন্নয়ন সাহায্যের নামে এসব দেশের সমাজকে বিভক্ত করে নিজেদের দেশের পণ্যের জন্য বাজার সৃষ্টি করে দাতা দেশগুলি সুকৌশলে নিজেদের স্বার্থে কাজ করে গেছে গ্রহীতা দেশগুলির উন্নয়নপ্রচেষ্টা ব্যাহত অথবা বিকৃত করে।"

বাংলাদেশের পটভূমিকায় পরিস্থিতির চিত্রণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : "আজকে আমাদের জাতীয় আত্মবিকাশের পথে প্রধান বাধা স্বাধীনতা লাভের পরে সৃষ্ট জাতির মধ্যেকার বিরাট আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং দেশের শ্রমজীবি মানুষের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই তার শিক্ষা ও চিন্তাশীলতার জন্য জাতীয় চেতনার অগ্রণী নায়ক। মুক্তিযুদ্ধের সময় ও স্বাধীনতা লাভের পর কিছু দিন দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সংহতি সহশ্রম ও সহউন্নয়ন উদ্যোগের যে ধারাটি জন্ম নিয়েছিল সেই ধারাটির বিকাশেই জাতির প্রেরণামূলক আত্মবিকাশ হতে পারতো, সাধারণ জনগণের সৃষ্টিশীলতা মধ্যবিত্তের সাহচর্যে সহায়তায় ও সেই সৃষ্টিশীলতাভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের 'আরটিকুলেশনে' প্রেরণা পেতো, সামাজিক স্বীকৃতি পেতো। আজ সেই ধারাটি শুষ্ক। আমরা আজকে আর দেশের নিম্নবিত্ত কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী জনগণের সঙ্গে একাসনে বসতে প্রস্তুত নই। যদিও একাত্তরে বসেছিলাম, এক পাতে খেয়েছিলাম, এক মাটিতে শুয়েছিলামও। আজকে

আমাদের কৃষক ও শ্রমজীবিগণ তাদের সৃষ্টিলতা বিকাশের সুযোগ না পেয়ে ও জীবনের ভার বইতে না পেরে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরে ছিন্নমূল বস্তিবাসী হয়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে রোধ করার জন্য মধ্যবিত্তরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আজকে আর গ্রামবাসীদের কাছে যেয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতি গড়তে মাটিতে হাত দিচ্ছে না, যেমন দিয়েছিল স্বাধীনতা লাভের পর। আমাদের ছাত্রসমাজের মধ্যে থেকেও এরকম স্পৃহা, দৈহিক শ্রমের প্রতি এই সম্মানবোধ অবলুপ্ত হয়ে গেছে সামগ্রিক মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবেই।"

বিদগ্ধ চিন্তকের বক্তৃতার পরবর্তী তিনটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সম্পর্কে বক্তব্য সমাপ্ত করছি :

"দেশের সাধারণ জনগণের সঙ্গে আমাদের ব্যবধানের এই 'উন্নয়ন' আমাদের মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের সব চেয়ে বড় পরাজয়। আমাদের জাতিসত্তা আজ গভীর প্রশ্নের সম্মুখীন। অন্যান্য প্রশ্নে আমাদের মধ্যেই অনেক বিভেদ, কিন্তু আমাদের আত্মসত্তার চেতনায় এই যে বিরাট বিভেদ গড়ে উঠেছে যার জন্য আমরা আমাদের কৃষক-শ্রমিকদের সৃষ্টিশীলতা থেকে প্রেরণা নিতে পারছি না, এই সৃষ্টিশীলতার বিকাশে সাহায্য করতে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারছি না, এমনকি, আমরা আমাদের গোষ্ঠীভিত্তিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণ জনগণকে মৃত্যুর মুখে পর্যন্ত ঠেলে দিচ্ছি, এই বিভেদ আমাদের জাতীয়তাবাদের যে-কোন সংজ্ঞাকে গভীর প্রশ্ন করছেন — আমরা কী এক জাতি, আমরা কী একই বাঙালি, একই ধর্মাবলম্বী।

"এই প্রশ্নের মানসিক বা নৈতিক দিকটা বাদ দিলেও শুধু পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে বিচার করলেও একথা অনস্বীকার্য যে দেশের বিপুলতম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মবোধ না থাকলে আমাদের জাতিগত ভিত্তিকেই আমরা অস্বীকার করবো এবং জাতীয়তার প্রশ্নে আমরা মাটিতে পা না রেখে শূন্যেই ঝুলতে থাকবো। জাতীয়তার প্রশ্নের মীমাংসা তর্কে হতে পারে না, বিমূর্ত ভাবে আমরা আগে বাঙালি না আগে মুসলমান এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর গর্বভরে ঘোষণা করে হয় না, এ প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে কেবল জাতির মধ্যেকার অন্তঃবন্ধন সুদৃঢ় করে যে বন্ধন মালা হয়ে তার সুগন্ধ আপনিই ছড়াবে। এই বন্ধন আজকে ছিন্ন।

"এই ছিন্নতার ফাঁক দিয়ে আর একটি কালো হাত সমাজ-জীবনের গভীরে ঢোকার সুযোগ পেয়েছে। ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতীয় অন্তঃবন্ধন যখন সুদৃঢ় ছিল এবং জাতি যখন একত্রে নিজের আত্মপ্রকাশের অধিকারের সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তখন ধর্মীয় মৌলবাদ এমনভাবে সমাজে স্থান পায় নাই যেমন আজকে পাচ্ছে। মানুষ যখন তার জীবন-সংগ্রামে সমাজের বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত শ্রেণীর কাছ থেকে সাহচর্য পায় ও অর্থবহ দিকনির্দেশ পায় তখন তার অপর কারো কাছ থেকে মৌলবাদী ফতোয়ার প্রয়োজন হয় না, এরকম ফতোয়া প্রতিরোধ করার শক্তিও তার মধ্যে আসে। কিন্তু মানুষ যখন শুধু শোষণে নিপীড়নে বিধ্বস্তই নয়, সাথীহীন হয়ে পড়ে, যখন শিক্ষিত সমাজের কাছেই সে বারে বারে প্রতারিত হয় তখন সে নিজেও মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। আমাদের জনগণ বারে বারে বিশ্বাস করে প্রতারিত দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছেই। তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তারা শোষণমুক্ত সমাজ পাবে, আমরা বুদ্ধিজীবিরাই তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি পাশ্চাত্য ছাঁচের গণতন্ত্রই তাদের কল্যাণ আনবে। আমাদের বিশ্বাস করে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে, গণতন্ত্রের ভোটের খেলা নিষ্ঠার সঙ্গে খেলে বারে বারে প্রতারিত হয়েছে। আজকে তাদের কাছে আমরা বাজার-অর্থনীতির ফতোয়াই ঝাড়ছি যার মধ্যেও তারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন প্রতিফলন দেখছে না, বাজারের দ্বারে হাত পেতে আমাদের কৃষক ও শ্রমিকরা তো পরিহাস ও বঞ্চনা পেয়েই ফিরে আসছে কিংবা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। এও তো এক ধরনের মৌলবাদই যার পেছনে গণকল্যাণের কোন যৌক্তিক প্রতিশ্রুতি নেই, বাজার যারা ছলেবলে কৌশলে কুক্ষিগত করতে পারবে শুধু তাদেরই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি আছে। দেশের শিক্ষিত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজের কাছ থেকে এভাবে প্রতারণা পেয়ে পেয়ে সাধারণ জনগণ যদি ধর্মীয় মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এটি অস্বাভাবিক নয়। এর উত্তর শুধু ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম করা নয়, জনগণকে বাস্তব সাহচর্যের মধ্য দিয়ে আশ্বাস দেওয়া যে দেশের বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত সমাজ তাদের জীবন-সংগ্রামে তাদের সঙ্গেই রয়েছে এবং আমাদের বিচারবুদ্ধি সত্যি-সত্যিই তাদের কল্যাণেই নিয়োজিত। এইভাবে জনগণের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব লোপ করতে না পারলে এবং আমরা নিজেরাও বিশ্ব কায়েমি স্বার্থের কাছ থেকে শেখা বুলি মৌলবাদীর মত আউড়ান বন্ধ করে আমাদের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক ও গণ জীবনের স্বকীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় আত্মবিকাশের পথ সন্ধান করে সেই পথে চলবার জন্য জনগণের হাত ধরতে না পারলে, সমাজে ধর্মীয় মৌলবাদের জন্য প্রশস্ত অঙ্গন থেকেই যাবে।"

গ্রন্থ সমালোচনা

মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ভবতোষ দত্ত

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা যথেষ্ট দুঃসাহসিক কাজ। হরপ্রসাদের কাজ তো কেবল একটা ধারানুসারী নয় কিংবা একটা বিশেষ শ্রেণী নিয়েও নয়। প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের ধর্ম সংস্কৃতির অজস্র বৈচিত্র্য তাঁর ব্যাপক পর্যবেক্ষণ এবং মননের বিষয় ছিল। হিন্দু ধর্ম ও দর্শন, বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন, পৌরাণিক সংস্কৃতি, মধ্যযুগের ভারত ইতিহাস, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সমাজজীবন ইতিহাস, লোকায়ত দর্শন, লোকসংস্কৃতি, ভাষার রহস্য, ন্যায়বেদান্ত তন্ত্র, বৌদ্ধ চর্যাপদ ও তার ধর্মদর্শন, মঙ্গলকাব্য, ইংরেজ আসার পর বাংলা সাহিত্য — হরপ্রসাদের মনীষার বিপুলতা অমাদের কাছে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর আবিষ্কৃত পুঁথি এবং মৌলিক ঐতিহাসিক তথ্যের পরিমাণও কম নয়। যে কোনও একটি মৌলিক আবিষ্কারই যেখানে যে কোনো লেখককে স্মরণীয় করে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত পুঁথি এবং ঐতিহাসিক তথ্যের পরিমাণ অবিশ্বাস্য রকমের প্রচুর।

শুধু তাই নয়। হরপ্রসাদ সৃষ্টিমূলক রচনা উপন্যাসও লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে সেগুলি সম্ভ্রমের সঙ্গেই বিবেচিত হয়ে থাকে। বিশেষত, 'বাল্মীকির জয়' নামক রূপকরচনাটি তো বাংলায় একবারেই অনন্যসাধারণ যার উৎকর্ষে চমৎকৃত হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র তার গোত্র নির্ণয় করতে পারেননি। কাঞ্চনমালা এবং বেনের মেয়ের আলোচনা বাদ দিলে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না।

এ হেন পণ্ডিত-মনীষীর সাহিত্যকীর্তির আলোচনা করতে যোগ্যতা থাকা চাই। যোগ্যতা বলতে দু-রকমের জিনিস বোঝাবে। এক হচ্ছে, এই সব বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা এবং জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়। এর জন্য দরকার শ্রম, ধৈর্য, অধ্যবসায়। আর যে জিনিস দরকার, এগুলির যথার্থ মূল্য নিরূপণ করবার মতো বৈদগ্ধ। হরপ্রসাদ চর্যাপদ আবিষ্কার করেছিলেন, এ তথ্যটি শ্রম-সহকারে জানা যেতে পারে, কিন্তু চর্যাপদের গুরুত্ব বোঝবার জন্য দৃষ্টি বিশ্লেষণবুদ্ধি এবং উপলব্ধি দরকার। হরপ্রসাদের সাহিত্যকর্মের ব্যাপকতাকে আপন বুদ্ধি এবং বিচারের আয়ত্তাধীন করবার চেষ্টাকে তাই দুঃসাহসিক বলেই মনে হয়। এই দুঃসাহসিক কর্মে এগিয়ে এসেছেন শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার। এজন্যে প্রথমেই তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানানো কর্তব্য। তিনি অবশ্য কিছু কিছু পূর্বসূরীর সাহায্য পেয়েছেন। নৈহাটির হরপ্রসাদ গবেষণাকেন্দ্র থেকে শাস্ত্রীয় সমগ্র রচনার যে সটীক সংগ্রহ বেরিয়েছে, সম্পাদক সত্যজিৎ চৌধুরী তাঁর উপযুক্ত সহযোগীদের নিয়ে তার সম্পাদনায় গভীর বিচারবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন, শিপ্রার কাজে তার সাহায্য অল্প নয়। হরপ্রসাদের সুযোগ্য শিষ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে হরপ্রসাদের রচনাবলী দুই খণ্ডে সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি তাতে যে টীকা যোজনা করেছিলেন সেগুলি অমূল্য তথ্যের আকর। কিন্তু শিপ্রার কাজ আলাদা এবং সেজন্য তার নিজস্ব বিচারবোধের প্রয়োজন খুবই বেশি।

হরপ্রসাদ সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে গভীর শ্রদ্ধা যেমন আছে তেমনি একটা দ্বিধান্বিত ধারণাও চলিত আছে। তিনি তাঁর লেখায় অনেক সময় আকরসূত্রের উল্লেখ করেননি। তাঁর অপর শিষ্য সুশীলকুমার দে এজন্য অসন্তোষ গোপন রাখেননি। তাঁর প্রাসঙ্গিক উক্তি —

"হরপ্রসাদ ইতিহাসকে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিতে পারিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কল্পনা গল্পকেও ইতিহাসে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হইত না।"

সুনীতিকুমার হরপ্রসাদের রচনার সম্পাদনা কালে এই অভাব পূরণ করবার চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজস্ব অবিশ্বাস্য স্মৃতিশক্তি এবং পাণ্ডিত্যের সাহায্যে। তবে শিপ্রা যা করেছেন তা গ্রন্থসম্পাদনা নয়। তিনি হরপ্রসাদের বিভিন্ন দিকের দানের সামগ্রিক পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর বইয়ের অধ্যায়গুলি এইরকম — জীবনকথা, হরপ্রসাদের মানসগঠন, পুরাণকাহিনী ও উপন্যাস, গবেষণাকর্ম — বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য এবং ইতিহাস, আলোচনা ও সমালোচনা : সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা এবং সৃজনশীল প্রবন্ধ, হরপ্রসাদের ভাষা ও রচনারীতি, উপসংহার। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি অধ্যায় স্বাভাবিক অনুসন্ধান-সাধ্য রচনা। চতুর্থ অধ্যায়তেই লেখিকা হরপ্রসাদের ইতিহাস ধর্মসংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণার বিবরণ দিয়েছেন। অন্য অধ্যায়গুলির সঙ্গে তুলনায় এটি সবচেয়ে বড়ো। কিন্তু লেখিকার কৃতিত্ব এতে সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে বলে আমাদের ধারণা। হরপ্রসাদের বিস্তৃত গবেষণা-কর্মকে সংহত আকারে এই পরিসরে নিয়ে আসাই বিশেষ কৃতিত্বের বিষয়। আলোচনা তালিকামাত্রে পর্যবসিত হয়নি। হরপ্রসাদের প্রচুর প্রবন্ধ তিনি পড়েছেন, তাদের সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদ তিনি দিয়েছেন। ফলে এই অধ্যায় ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে অশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, হাজার বছরের পুরনো বাংলা গান — এই দু'টি প্রাচীন বাংলার ইতিহাস উদ্ধারে হরপ্রসাদের চিরস্মরণীয় দান। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থেকে হরপ্রসাদ বহু প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু পুঁথি সংগ্রহ করেন। তার মধ্যে লেখিকা দেখিয়েছেন এগারোটি পুঁথি মুসলমান আগমনের পূর্বের। বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ে হরপ্রসাদ অগ্রণী বিশেষজ্ঞ। লেখিকা এই অধ্যায়ে হরপ্রসাদের বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি আলোচনা করে মর্ম সংগ্রহ করে দিয়েছেন

— এটা আমাদের পরম লাভ গণ্য করি।

মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের দানের মতোই মূল্যবান তাঁর সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি। কালিদাস-ভবভূতির কাব্যনাট্য, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এবং উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য — এই তিন বিষয়েই তাঁর সমান দক্ষতা। হরপ্রসাদের সাহিত্য-সমালোচনামূলক লেখাগুলি সাহিত্যশাস্ত্রানুগত আলোচনা নয় — একেবারেই নিজের ভঙ্গিতে আস্বাদন করা লেখা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যালোচনায় তাঁর কবিদৃষ্টি এবং কল্পনাই যেন বড়ো হয়ে ওঠে। হরপ্রসাদের আলোচনা একেবারেই মানবিক। এ ভঙ্গিতে সাহিত্যালোচনা যে কতখানি উপভোগ্য হতে পারে হরপ্রসাদের মেঘদূত আলোচনা তার চমৎকার দৃষ্টান্ত। পাঠকেরা লক্ষ করবেন বাংলা সমালোচনায় যাঁরা বিশিষ্ট বলে স্বীকৃত, হরপ্রসাদের নাম তাঁদের মধ্যে থাকে না। সম্ভবত তার কারণ এই যে হরপ্রসাদ পাশ্চাত্য বা সংস্কৃত কোনও রীতিকেই অনুসরণ করেননি। তাঁর কোনও কোনও সাহিত্য সমালোচনা ইতিহাসাশ্রয়ী — এই পর্যন্ত বলা যায়। লেখিকা হরপ্রসাদের সমালোচনামূলক প্রবন্ধের বক্তব্য সংক্ষেপে বললেও সমালোচনা-রীতি সম্বন্ধে কিছু বলেননি।

হরপ্রসাদের আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধ সমকালীন সমাজ অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক। এগুলি খানিকটা যেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বস্তুত প্রতিভার ধর্মানুসারে বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ একই শ্রেণীভুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর কাছে শিক্ষানবিশি করে হরপ্রসাদ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকী প্রতিভা এবং হরপ্রসাদের বাল্মীকির জয় প্রায় একইকালের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র দু'টিই পড়েছিলেন, দু'টির সম্পর্কেই মন্তব্য করেছিলেন। লেখিকা এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন যথাযথভাবেই। হরপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে সাত বছরের বড়ো ছিলেন। বঙ্কিমের প্রতি হরপ্রসাদের শ্রদ্ধা ও গুণগ্রাহিতা কোনওদিন এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। এমনকি রবীন্দ্রযুগ নামে পরিচিত বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে হরপ্রসাদ সাহিত্য নিয়ে ব্যাপৃত থেকেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রযুগের প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। দু'জনের মধ্যে সক্রিয় যোগাযোগের কোনও নিদর্শনও দেখতে পাই না। রবীন্দ্রনাথের ষাট বৎসর হওয়া উপলক্ষ্যে হরপ্রসাদ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে তাঁকে যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তাতে 'শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ' সম্বোধন এবং রবীন্দ্রনাথের বংশ এবং তাঁর প্রতিভা বিকাশের যে বর্ণনা আছে তার স্নেহস্নিগ্ধ গুণানুবাদ আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথও শাস্ত্রীমশায়ের পাণ্ডিত্য ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ ছিলেন। তথাপি বিশ শতকের প্রথম দশকে সাহিত্য পরিষদে ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা ছাড়া দু'জনের মধ্যে সাহিত্যিক যোগাযোগের কোনো নিদর্শন নেই। হরপ্রসাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমজন্মোৎসব অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে হরপ্রসাদকে জড়িত করেছিলেন বা করতে চেয়েছিলেন, এমন কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই।

অবশ্য এই উল্লেখ দিয়ে দু'জনের সম্পর্কের বৈরাগ্যের একেবারেই কোনো ইঙ্গিত করছি না। যেটা বলতে চাই, সেটা এই যে দু'জন যেন দুই যুগের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে তুলনা করতেন। বঙ্কিমের মতো জাতীয়তাবোধ হরপ্রসাদে সে রকম তীব্র না হলেও অতীতচারণ ও অতীত গৌরববোধ তাঁর ছিল। তাঁর বিশেষত্ব এই যে শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা নয়, তার সঙ্গে যেন হরপ্রসাদের নিজস্ব ভঙ্গির একটা ভালোলাগা মন্দলাগার অনুভব ছিল। এই কারণেই বোধ হয় হরপ্রসাদ সব সময় পদ্ধতিসম্মতভাবে আকরসূত্রের উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করতেন না। বিশ শতকের ইতিহাস-অনুসন্ধান পদ্ধতিতে নির্জলা তথ্যসন্ধান এবং প্রমাণ উল্লেখের বাড়াবাড়ি হরপ্রসাদকে বিরক্ত করে তুলেছিল।

লেখিকা হরপ্রসাদের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সর্বাঙ্গসুন্দর আলোচনা করেছেন। 'কাঞ্চনমালা', বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, রাজসিংহের সমকালের রচনা। আবার 'বেনের মেয়ে' লেখা চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে এবং শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন-এর পরে এবং গৃহদাহের প্রায় সমকালে। এই প্রসঙ্গে লেখিকার মন্তব্যটি অর্থপূর্ণ — বেনের মেয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস বটে, কিন্তু বিষয়বস্তু সাধারণ জীবন থেকে নেওয়া এবং সেটা সে সময়ের বাস্তববাদী উপন্যাস রচনার প্রভাব।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মানস-গঠন অধ্যায়ে লেখিকা হরপ্রসাদের ব্যক্তিগত জীবনের পশ্চাৎপট বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গেই বিংশ শতাব্দীতে হরপ্রসাদের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের কথা থাকলে ভালো হত। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ইত্যাদির মননপূর্ণ রচনার সঙ্গে হরপ্রসাদের রচনার তুলনা অপ্রাসঙ্গিক হত না। মনে পড়ছে, প্রমথ চৌধুরীর রচনাকে হরপ্রসাদ চুটকি আখ্যা দেওয়ায় প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন 'চুটকি' প্রবন্ধ। আবার রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু চোখের সামনে দেখে তিনি বলেছিলেন 'চোখের সামনে বিদ্যার একটা জাহাজ ডুবিয়া গেল।'

বহুতথ্যে পূর্ণ শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদারের এই বই অজস্র সাধারণ রচনার মধ্যে চোখে পড়বার মতো অসাধারণ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম — শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার/ বাংলা একাডেমী, ঢাকা/ দুশো টাকা

জীবনানন্দ দাশ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

যতদিন বেঁচে ছিলেন জীবনানন্দ জনপ্রিয় হননি, তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি বাংলা ভাষায় বস্তুত ইংরেজি কবিতা লিখে গেছেন। যারা তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছিল তারা অধিকাংশ কেন প্রায় সবাই ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। সেখানকার চারশো বছরের পুরনো, পরিণত চিন্তা-ভাবনার রেশ মাতৃভাষায় প্রতিফলিত হতে দেখে তারা মুগ্ধ, উৎফুল্ল হয়েছে। না হলে, ব্লিজার্ড, লেগুন, ভ্যাম্পায়ার, নকটার্ন, প্যাশন, ফারো প্রভৃতি শব্দ বাঙালির মনে কোনও অভিমত সৃষ্টি করতে পারত না। তাঁর কবিতায় পরপর ব্যবহৃত সমুদ্র, জাহাজ, নাবিক, বন্দর, দ্বীপ, মাস্তুল প্রভৃতির উপমা ও রূপক বাঙালি জীবন থেকে বহু দূরে অবস্থিত থেকেও আবেগ সঞ্চার করবে, আশা করা ঠিক নয়। তিনি নিজে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, তাঁর সময়ের শক্তিমান কবিরা, যথা — বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, আরও কেউ কেউ, যাদের মতামতকে তিনি মূল্য দেন, সবাই, যাকে বলে, পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে আলোকপ্রাপ্ত। তাঁদের লেখাতেও শেকস্পীয়র, দান্তে, অ্যালান পো থেকে শুরু করে ইয়েটস, এলিয়টের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বস্তুত, সেই তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে ভাল করে পশ্চিমের বাতাস লাগল।

এর আগেও লেগেছে। সেই মাইকেল-বঙ্কিমের সময় থেকে, আসলে ইংরেজি প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যের শৈশবপুষ্টি, কিন্তু এ হল পুষ্টির উপরে প্রেরণা। মিশর, বেবিলোন পর্যন্ত পেছিয়ে, টপকে গিয়ে আমাদের হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্যে টান পড়ল। তখন আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। বৈদেশিকদের 'উজ্জ্বল আলো' আর 'ঘুরুনো সিঁড়ি' রপ্ত করতে আমাদের কিছু সময় লেগেছে।

এখন মনে হয়, জীবনানন্দের মূল তাড়না ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রশান্তিচক্র থেকে বেরিয়ে আসা। সংঘবদ্ধভাবে সে চেষ্টা অনেকেই করেছেন তখন। ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণেই করেছেন নতুন স্বাদ আনার চেষ্টা, কিন্তু বাংলাভাষার বুননেও রবীন্দ্রনাথ যে মায়াজাল তৈরি করে রেখেছিলেন, তা থেকে আর কেউ কেটে বেরিয়ে আসতে পারলেন না। নতুন ভাষা সৃষ্টি করার ঝুঁকি নিলেন না কেউ। জীবনানন্দ তাঁর নিজের কাজে লিপিকুশলতার ওপর জোর দিয়েছেন। সফলতার কথা না ভেবে, ব্যক্তিগত প্রয়াসে ও আকাঙ্ক্ষায়, সুলিপি সৃষ্টি করার জন্যও লেখা প্রয়োজন মনে করেছেন। কবিতায় আমদানি করেছেন বহু অসংস্কৃত, গ্রাম্য, সামাজিক শব্দ ও বাগ্‌ধারা। লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সেই উদ্ভাবিত সুলিপির সামঞ্জস্য থাকবে। যে কারণে নীড় নয়, নীড়ত্বের সঙ্গে চোখের তুলনা করলেন। কালো হরিণ চোখের দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিঘাত ছাপিয়ে আরো গভীরে নিয়ে যেতে চাইলেন তাঁর বক্তব্যকে। অনেক ক্ষেত্রে, তখন মনে হয়েছিল, সফল হননি, কালক্রমে আমরা তাঁর মতো করে দেখতে শিখলাম।

রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ছিলেন ব্রাহ্ম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো আধ্যাত্মিক ভাবনাকে প্রশ্রয় তিনি দেননি। এই মূর্তিপূজকের দেশে জীবনানন্দ প্রথম থেকে সমাচ্ছন্ন দুর্বিপাকে ভারাক্রান্ত মানবজাতির কথা বলে গেলেন। ব্যক্তিমানুষও তাঁর অন্তর্গত। তার কোনও উদ্ধারকর্তা নেই। জীবন ও প্রকৃতিকে দেখলেন ঝিঁক চোখে। সুলিপি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টায় কবিতার শরীরে স্থাপন করলেন এমন সব শব্দ ও অভিব্যক্তি, এমন সব চিত্ররূপ, অপ্রচল বিশ্লেষণ — কল্পনা প্রতিভার ব্যাখ্যাতেও যা খানিকটা কৃত্রিম। ধাতব। যে চাঁদকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন তরণীর মতো, সুধারসে ভরা, জীবনানন্দের মৌলিক প্রয়োগে তার শিং গজালো, তার আকৃতি হল বৃদ্ধার মুখের মতো। পরে অবস্থা বিপর্যয়ে অপর কবির চোখে চাঁদকে কাস্তের মতো বাঁকা, কখনো বা ঝলসানো রুটির মতো কর্কশ দেখিয়েছে। সুন্দর কুৎসিতের ভেদরেখা ঘুচিয়ে দিয়ে জীবনানন্দই প্রথম এক ধরনের প্রকৃতিবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। যা সংস্কারমুক্ত। আমরা যে ভারতীয় ঐতিহ্যের গর্ব করি আসলে তা স্বাবলম্বী নয়, তার নিজস্ব মেরুদণ্ড নেই, জীবনানন্দে তা প্রমাণিত হল। এই প্রমাণ তিনি সচেতনভাবে রাখতে চেয়েছেন বলে মনে হয়।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ বইটি হাতে পেয়ে এই সব কথা মনে হল। তাঁকে নিয়ে ঢের লেখালেখি হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আরও যা লেখালেখি হবে, তা গবেষকরা লিখবেন। এখানে বইটির একটু পরিচয় দিই।

ন'শো পৃষ্ঠার বই এই কাব্যসংগ্রহ। স্মল পাইকায় ঝরঝরে ছাপা। খুললেই সঞ্চয়িতার কথা মনে হয়। সেই রকমই অক্ষরবিন্যাস, কেবল অ্যা-কারের বিশেষ ব্যবহারটি অনুপস্থিত। ছ'টি ইংরেজি ভাষায় লেখা কবিতা বাদ দিলে সর্বসাকুল্যে ৫৯৭টি বাংলা কবিতা, তার মধ্যে ২৪৬টি গ্রন্থভুক্ত হয়নি এ-যাবৎ। এছাড়া, খসড়া, পাঠান্তর ও আনুষঙ্গিক কবিতা নিয়ে একটি পরিচ্ছেদ। পরিশিষ্ট অংশে কবির কিছু চিঠিপত্র, আলোচনা। কবিতার নাম আর প্রথম ছত্র নিয়ে দু'রকম সূচিপত্র। প্রথমটির সঙ্গে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের খবর রয়েছে। উপরন্তু, প্রায় পাঁচিশ বছরের সংরক্ষিত আটচল্লিশটি পাণ্ডুলিপি-খাতার বিবরণ। কবির একটি প্রতিকৃতি — সেই বহু পরিচিত ফটোগ্রাফ — দীর্ঘ দু'টি চোখ ছাড়া আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, বৈশিষ্ট্য আরোপের চেষ্টাও নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল কবির জীবন ও কবিতা নিয়ে সম্পাদকের লেখা ১৪৩ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা যার মধ্যে তাঁর সম্পর্কে জানা আজানা সব তথ্যই গুছিয়ে বলা আছে। অনেক বিভ্রান্তির

নিরসনও করা আছে।

যেমন, 'ক্যাম্পে' অথবা 'পিপাসার গান' অথবা 'অবসরের গান' [illegible] ভগিনীর ভ্রাতৃপ্রেম অথবা শসাশীর্ষে স্তনশ্যামমুখ [illegible] জীবনানন্দের সিটি কলেজের চাকরি যায়নি। [illegible] সুকুমার [illegible] বিভ্রান্তিকর। ১৯২৮ সালে সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে ছাত্রবিক্ষোভ ঘটে, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ছিলেন ঘোর মূর্তিপুজো বিরোধী। দু'হাজার ছাত্র কলেজ ত্যাগ করায় অর্থ সংকটে পড়ে কর্তৃপক্ষ কয়েকজন অধ্যাপককে ছাঁটাই করেন। সর্বকনিষ্ঠ ইংরেজি লেকচারার হিসেবে জীবনানন্দ চাকরি খোয়ান। এই হল ঘটনা। ব্রাহ্ম কলেজে মূর্তিপুজো হওয়া উচিত, কি উচিত নয়, এই বিতর্কে সুভাষচন্দ্র বসু এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই জড়িয়ে পড়েছেন দেখা যায়। জীবনে অনেকগুলি চাকরি করেছেন জীবনানন্দ, কিন্তু কোথাও থিতু হতে পারেননি, সেটিও লক্ষ করার বিষয়।

ধূসর পাণ্ডুলিপি পর্যায়ে সমান্তরালভাবে জীবনানন্দ রূপসী বাংলার কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন। তার পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। বাংলার লোকজীবন-কেন্দ্রিক ঐতিহ্য তার উপজীব্য। এটা কি পরীক্ষা ছিল, না দু'দিকে বাজি রাখা? সেগুলির একটিও তো তিনি প্রকাশ করতে দেননি জীবনকালে, এখবর আমরা জানি। যা তত স্পষ্ট ভাবে জানতাম না, তা হল, ওই একই সময়ে সমান্তরালভাবে তিনি একান্নটি খাতা ভরে মোট ছিয়ানব্বইটি গল্পও লিখেছিলেন। সেগুলিও অপ্রকাশিত ছিল তাঁর জীবনকালে। এখন ক্রমে ক্রমে ছাপা হচ্ছে, আর আমরা দেখতে পাচ্ছি, লেখক নিজে এই সব গল্পে তাঁর কবিতার চেয়ে অনেক বেশি করে উপস্থিত। কারুকর্মও যথেষ্ট শিথিল। চিন্তা-ভাবনা মগ্ন, আত্মকেন্দ্রিক। বাইরের জীবন ঘটনা ও চরিত্রগত বৈচিত্র্য বিষয়ে যতখানি কৌতূহল থাকলে গল্প টানটান করে বোনা যায়, তা না থাকায় সেগুলি সুখপাঠ্য সরস হয়নি। এখন প্রশ্ন হল, এ কী রকম তাড়না, কী ধরনের প্ররোচনা, যে লেখককে তিন প্রক্রিয়ায় সৃজনকাজ করতে হচ্ছে, খাতার পর খাতা, অথচ তার অধিকাংশ তিনি প্রকাশের জন্য অনুমোদন করছেন না? তা হলে লিখছেন কেন? একটি আধটি নয়, প্রায় একশোটি গল্প — এক জীবনে অনেক কথা-সাহিত্যিক যা লিখে উঠতে পারেন না। কাব্যসমগ্রের সম্পাদক এই ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, "এই সব উপর্যুপরি গল্প" তাঁর কবিতা লেখার ওপর আগেকার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার ফল হতে পারে।

তা যদি হয়, তবে শিল্পীজীবনের মূল প্রশ্নে এসে আমরা ঠেকে যাচ্ছি। শিল্পের স্রষ্টা কি কখনোই বুঝতে পারেন না, তাঁর কাজ ঠিকঠাক হল, কি হল না? সমকালের গ্রাহক-অভ্যর্থনা না পেলে তিনি কি তাঁর কাজ নষ্ট করে ফেলবেন? জীবনানন্দ অবশ্য কিছুই নষ্ট করে যাননি। বাক্সবন্দী করে রেখে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, হয়ত এই আশায় যে, তিরিশ চল্লিশ বছর পরে তাঁর লেখার কদর হবে। আমরা তাঁর এই দুর্মর আস্থাকে শ্রদ্ধা করি।

তাঁর পঞ্চান্ন বছরের জীবনে জীবনানন্দ নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ "জীবনানন্দ দাশ — বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত"-এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে। তার পুনরাবৃত্তি না করলাম। নতুন যে খবরটি এই গ্রন্থে পাচ্ছি, তা হল, দেশ বিভাগের কিছু আগে তিনি ল্যান্সডাউন রোডে একটি বাসা ভাড়া করেন ও সেখানে সপরিবারে থাকতে শুরু করেন। ১৯৫০-৫১ সালে সম্ভবত তাঁর নিজের কোনও চাকরি ছিল না। তাঁর স্ত্রীও তখন বি টি পাশ করার অপেক্ষায় বেকার। এই সময়ে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য লাঘব করতে তিনি বাসাবাড়ির একখানি ঘর সাবলেট করেছিলেন জীবনবীমা সংস্থার কর্মী এক মহিলাকে। এই মহিলা তাঁর চরম অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার ঘরে নিত্য সন্ধ্যায়, রাত্রে জটিল জনসমাগম হত এবং তাদের হৃদয়হীন চিৎকারের নির্যাতন সহ্য করতে হত জীবনানন্দ পরিবারকে। অনেক চেষ্টা করেও তাকে তোলা যায়নি। বাসা বদলাতে চেয়েও পারেননি। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন সঙ্গিন হয়ে ওঠে যে তাঁর লেখালেখি প্রায় বন্ধ হবার মতো। শোনা যায়, এই সময় নানা ব্যক্তির সাহায্য চেয়েছিলেন, তার মধ্যে লেখিকা বাণী রায় একজন। তাঁকে বলেছিলেন, 'লিখবার অবকাশ বা নির্জনতা পাই না। কত কী লিখবার আছে। আপনার ঘরটি যদি পেতাম।' এরপর তাঁর স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়। রক্তচাপ ও মানসিক দৌর্বল্যে ভুগতে থাকেন। এই ব্যাপার জানার পর ১৪ অক্টোবর ১৯৫৪ সন্ধ্যায় ট্রামের ধাক্কায় গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা আর অস্বাভাবিক মনে হয় না। মনে হয় না, জীবনানন্দ দাশ আত্মঘাতী ক্লান্তির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। আসলে, কঠিন সময় তাঁকে নিজের মতো করে বাঁচতে দেয়নি। না দিক। তাঁকে দিয়ে সহজ সফলতার পতাকাও বহন করাতে পারেনি, তাই তিনি টিকে গেলেন।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ — দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত/ ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩/ দুইশত টাকা

জ্যোতির্ময়ী দেবীর নারীবাদ পুরুষবিদ্বেষে বেসামাল নয়

মীনাক্ষী ঘোষ

"মানুষের সেকেলে হ'তে তবে ক'বছর লাগে? আশ্বস্তভাবে মনে হ'ল তাহলে হয়ত সেকেলে ও একেলের মধ্যে বেশী ব্যবধান নেই।" [পৃ: ২৪৫: একটি সেকেলে লেখক: ২য় খণ্ড, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন]

একটি ছোট গল্পে ব্যবহৃত লেখিকার উক্ত সংলাপটিই বারে বারে মনে হয়েছে 'জ্যোতির্ময়ীদেবীর রচনা সংকলন' পড়বার সময়। প্রখর সচেতনতা এবং সুগভীর সহানুভূতি যে কলমে প্রকাশ পায়, প্রাচীনত্বের ঘুণ তাকে সহজে স্পর্শ করে না। সেকাল এবং একালের ছোট ছোট বেড়া পার করে হৃদয়ের যে গভীর প্রদেশে সর্বকালের মানুষ মোটামুটি একাকার, লেখিকা প্রায়শই সেইখানে পৌঁছে দিতে পেরেছেন পাঠককে।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনার প্রধান লক্ষ্য এবং সর্বাধিক ঐশ্বর্যময় বিষয়বস্তু হল নারীবাদ। এই অতি আধুনিক বিষয়টিকে সেই অতীতেই কতখানি আধুনিক বলিষ্ঠতায় প্রকাশ করা হয়ে গেছে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। প্রবন্ধে-গল্পে-উপন্যাসে নারীর অপরিসীম অবমাননা, অনন্ত দুঃখ, বিচারহীন ব্যর্থতা পাঠককে সমূলে নাড়া দিয়ে যায়।

যখন বাস্তব, ব্যাপক এবং দুরূহ কোন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে কলম ধরা হয় তখন সমাজের উপর সে রচনার প্রভাব সম্পর্কেও স্রষ্টার একটা দায়ভাগ থাকে। প্রতিবাদ তো চাই কিন্তু প্রতিবাদী লেখনী মানুষের দৃষ্টির আচ্ছন্নতাকে নষ্ট করতে সাহায্য করছে কিনা, সমাজকে মঙ্গলের পথে উত্তীর্ণ করতে আগ্রহী কিনা — এই জাতীয় বিচার সহজেই এসে পড়ে পাঠকের মনে।

নারীর দুঃখ-পরাধীনতার প্রতিবাদে আগ্নেয়গিরি তসলিমার যুগে দাঁড়িয়ে বিশেষভাবেই মনে হয়েছে এখন জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রয়োজন বড় বেশি। প্রতিবাদের চেহারায় যেখানে লাভা উদ্গীরণ, সেখানে বরাভয়ের চেয়ে ভয় বেশি। তেমন ধরনের প্রতিবাদী অগ্ন্যুৎপাত ব্যক্তিবিশেষকে যতখানি খ্যাতিমান করে সমাজকে তেমন লাভবান করে না। আলোচ্য লেখিকা অতএব শব্দচয়নের সময়-দামামার পরিবর্তে শঙ্খধ্বনিকে হৃদয়ে রেখেছেন। নারীমুক্তির আসক্তিতে তিনি কখনও পুরুষবিদ্বেষে ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত, বেসামাল নন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতামতগুলি যথেষ্ট সবল কিন্তু তা তলোয়ার নয় — তা লাঙলের মতো মানুষের হৃদয়কে কর্ষণের দ্বারা সম্ভাবনাময় করে তোলে। তাঁর প্রবন্ধগুলি মানুষকে ভাবতে শেখাবে, অনাবশ্যক আঘাতের দ্বারা ক্ষিপ্ত করে তুলবে না। নারী সম্পর্কে তাঁর যন্ত্রণাবোধ এত সত্য এবং এত গভীর যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিষণ্ণ মনে, আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করবে — ঘুচে যাক এ অসহনীয় অন্ধকার।

"নারীর সুলভতা" প্রবন্ধে লেখিকা দেখিয়েছেন নারীর কঠিনতম অবমাননার কারণ হচ্ছে সে বড় সহজলভ্য। নানা দিক দিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করেও নারী তার মহত্ত্বের স্বীকৃতি পায় না। তার সমস্ত আত্মত্যাগও এতই সুলভ যে কেউই তার মূল্য বুঝবার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না। স্বয়ং নারীকে এবং নারী সম্পর্কে পুরুষকে সচেতন করে তোলার এই জাতীয় মহৎ প্রচেষ্টায় তিনি লিখেছেন "ভাইদের চঞ্চলতা, আবদার এমনকি অসঙ্গত শাসন-পীড়নও আত্মীয়স্বজনের চোখে 'বাল-গোপালের' লীলা। কিন্তু বালিকা বোনটিকে বা বোনগুলিকে 'গৌরী' বা 'পার্বতী'র মতন দেখা হয় না।" (নারীর সুলভতা: পৃ ৩৪১: ১ম খণ্ড)

"সমাজের একটি অন্ধকার দিক" প্রবন্ধে বারবণিতা সম্পর্কে তাঁর দু:খী এবং ক্ষুব্ধ মন্তব্য লক্ষণীয় — "মানুষ পৃথিবীতে একটা জাত। তার আবার দুভাগ স্ত্রী ও পুরুষ। কিন্তু তাতে মানুষের সমস্যা মেটেনি, কে স্ত্রী জাতির মধ্যেও দাগ কেটে দুজন ক'রেছে"। এই 'দাগ' এর প্রতিকারের জন্য প্রবন্ধের শেষে নারীদেরই আহ্বান করেছেন লেখিকা — "মেয়েরাই' এই সমস্যার প্রসার বন্ধ করার চেষ্টা করুন।"

রাজাবাদশার মহলে নারীত্বের অবমাননা বেশকিছু ছোট গল্প এবং প্রবন্ধকে একইসাথে সমৃদ্ধ এবং মর্মস্পর্শী করেছে। যেহেতু লেখিকা ব্যক্তিগত জীবনে রাজস্থানের রাজপরিবারের সাথে কিছুটা যুক্ত ছিলেন সেহেতু রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত নারীদের জীবনযন্ত্রণা অত্যন্ত রকমের প্রাণবন্ত হয়েছে তাঁর রচনায়। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন তিনি রেখেছেন যা নারীমুক্তির ইতিহাসে মূল্যবান এবং অভিনব। রাজাবাদশার অন্দরমহলে সর্বদাই হাজার হাজার নারীর অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়। লেখিকার প্রশ্ন এই চার পাঁচ হাজার নারী থাকত কোথায়? কোন রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে চার-পাঁচ হাজার সংখ্যক ঘরের হদিশ তো মেলে না। বড় বড় দালান এবং হলঘরগুলির মধ্যেই অতএব গোয়ালঘর বা মুর্গিখাঁচার মত হাজার হাজার নারীর শয়ন ব্যবস্থা ছিল। শুধু কি একটুকরো ঘরেরই অভাব? হায়! তাদের জীবনে স্বামী, সন্তান, সংসার, শিক্ষাদীক্ষা — কোনকিছুই ছিল না। তবু যুগযুগান্তর ধরে হাজার হাজার নারী পশু বেঁচে থেকেছে বিনা প্রতিবাদে।

নারীবাদের পরেই যে ব্যাপারটি নজর কাড়ে তা হল রচনার পটভূমি। প্রায়ই সে পটভূমি রাজভূমি রাজস্থান। রাজস্থানের বিচিত্র পোষাক, গয়না, মেলা, উৎসব, ব্রতপার্বন, সামাজিক রীতিনীতি বিশদভাবে ছড়িয়ে আছে ছোটগল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধাবলীতে

এবং আত্মজীবনীতে — যা বাঙ্গালি পাঠককে অপরিচিত সুদূর এক জগতের মধ্যে জমিয়ে রাখে। দেশ-কাল সচেতনতা লেখার মধ্যে এনেছে একটা বিস্তৃত পরিধি। এই সব কিছুর উপরে রয়েছে রাজস্থানী রাজমহলের বহু আকর্ষণীয় কাহিনী। রাজবাড়ির দাসী, বাঁদী, সখী, পাশোয়ানজী (রাজার নেকনজরে পড়া প্রেয়সীর দল) খুশনজরজী, পর্দায়েত (রাজ-প্রিয়া), লালজীসাহেব ও বাঈজীলাল (রাজার ঔরসজাত বাঁদী পুত্র ও কন্যা) প্রভৃতিদের অজানা কাহিনী — রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী অন্য এক পৃথিবীর দরজা খুলে দেয়। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে নিঃসন্দেহে এ এক সালঙ্কারা সংযোজন।

রানীমহলের কথা বলেছেন যখন তখনও তাঁর দৃষ্টি মোহশূন্য, অনুভবী। তিনি শুধুমাত্র রানীদের রত্নালঙ্কারের মুগ্ধ সাক্ষী নন। রানীজীবনের ঐশ্বর্যের পাশাপাশি তাঁদের নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ নারীসত্তাকেও লক্ষ করেছেন তিনি। রাণী মহারানীদের হীরে জহরৎ মেলা-ই কিন্তু স্বামীপুত্রে ঘেরা একটুকরো নিবিড় সংসার তাঁদের কাছে ঈর্ষার বস্তু। লেখিকা যখন মা, বোন এবং সন্তান সহ রাজঅন্তঃপুরে বেড়াতে গেছেন তখন তিনি এ-সত্য উপলব্ধি করেছেন এবং অন্তর্ভুক্ত করেছেন আত্মজীবনী-তে।

আত্মজীবনী একটি সুসমৃদ্ধ রচনা। এতে মহারানীর আমলের রাজভক্তি, তৎকালীন বাংলা এবং রাজস্থানের পারিবারিক জীবন, উদার অতিথিসেবার মহৎ বিবরণ, রাজস্থানী প্রকৃতি, হিংস্র ব্যাঘ্র-নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ এবং লেখিকার বিভিন্ন রকমের বিচিত্র যত অভিজ্ঞতায় এ লেখাটি যেমন সুখপাঠ্য তেমনই তথ্যবহুল।

ছোট গল্পগুলির মধ্যে অনুভব যত গাঢ়, শিল্পবন্ধন ততটা কঠিন হয়ে ওঠেনি প্রায়শই। নারীদের প্রতি যে গভীর দরদ লেখিকার প্রধান হাতিয়ার সেই দরদের আধিক্যই ছোটগল্পের সটান ধনুকের ছিলা কেটেছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। "তারা রূপবতী" (দ্বিতীয় খণ্ড) গল্পটি পড়লে তিনটি সুন্দরী বারবণিতার সুখ-সম্মান-পরিচয়, নিরাপত্তাহীন জীবন-মৃত্যুর অতিবাস্তব বর্ণনায় শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু গল্পের শেষে দেখা যায় লেখিকা গল্প সম্পর্কে ততটা সচেতন হতে পারেননি যতটা হয়েছেন বীভৎস বাস্তব সম্পর্কে। "যাদের মৃতদেহ বাইরে আনার পথও পৃথক (রাজঅন্তপুরের গণিকারা মৃত্যুতেও নীচ অতএব তাদের শব দুর্গন্ধি নালার পাশের দেওয়াল ভেঙে বার করা হত। সাধারণ পথে তাদের মৃতদেহটিও থাকার অধিকারী ছিলনা) শ্মশান পৃথক", সেইসব মরণেও পতিতা নারীর দুঃখের সাথে লেখিকা একান্তভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন নিজেকে। অতএব রক্ষা করতে পারেননি শিল্পীসুলভ নিরাসক্তি। এ কাহিনীর শেষে লেখিকার নিজস্ব কলমে আটটি পঙ্‌ক্তি হঠাৎ যেন ছোট গল্পটিকে একটি বাস্তব বিবরণী সমন্বিত ডায়েরিতে পরিবর্তিত করে ফেলেছে।

রচনাবলীতে সংকলিত মোট তিনটি উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে এমন কিছু চমৎকারিত্ব নেই, কিন্তু দেশকাল সম্পর্কিত সচেতনতা সর্বত্রই প্রশংসনীয়। ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুন্দরভাবে যুক্ত হয়েছে চরিত্রগুলির সাথে যা সেকাল সম্পর্কে একালের পাঠকের কৌতূহল মেটাতে সক্ষম। উপন্যাসের গতি আর একটু বাড়ানো যেত পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে।

১ম খণ্ডের ১ম উপন্যাস 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' শুরু হয়েছে তৎকালীন বনেদিয়ানার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে। ভাষানৈপুণ্য দেখলে একালের পাঠকও মুগ্ধ হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঘটনাবলীর সজ্জায় মাঝে মাঝেই দুর্বলতা। যেমন, গল্পের নায়ক কথায় কথায় চাকরি ছেড়ে অথবা বাস ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। কোন মেয়ের সাথে বিয়ের কথা হলে চলে যাওয়াটা প্রথমবার বেমানান না দেখালেও দ্বিতীয় বারে ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বাস্তব মনে হতে চায় না। অতি ছোটখাট কারণে চাকরি এবং স্থান পরিবর্তন দেখলে মনে হয় লেখিকা উপন্যাসের গতি চালু রাখার জন্য এই সহজ পথটি বেছে নিয়েছেন। অবশ্য "এহ বাহ্য"। উপন্যাসের প্রাণ-চরিত্র সৃজনে জ্যোতির্ময়ী দেবীর কলম কোথাও কুণ্ঠিত নয় এবং এই কারণে লেখাগুলি উপভোগ্য এবং আকর্ষণীয়।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখায় যেমন ধার আছে তেমন আছে একটি প্রসন্ন কৌতুকগুণ। যেমন — রাজস্থানের রাজারানী প্রসঙ্গে এসেছে আমাদের দেশের রূপকথার রাজারানীর খবরাখবর। লেখিকা লিখছেন "রানীরা রাঁধতেন বাড়তেন বটে তবে রাজারা হাট বাজার করতেন কিনা বোঝা যায় না।" (এক যে ছিল রাজা : পৃ ৩০৫ : ২য় খণ্ড) এই ধরণের সূক্ষ্ম স্নিগ্ধ কৌতুকরস তাঁর রচনাগুলিকে সমৃদ্ধতর করেছে।

সবশেষে ফিরে আসি গোড়ার কথায়। শরৎচন্দ্রকে মনে রেখেও বলতে হয় অন্তঃপুরকে এমন নিজস্ব স্বভাবে তুলে ধরতে পারেননি কোন পুরুষ লেখক। রাজঅন্তঃপুর থেকে শুরু করে গেরস্ত বাড়ির অন্তঃপুর পর্যন্ত যে ব্যাপক অভিজ্ঞান জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন-এ রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে আধুনিক পাঠক, সাহিত্যিক এবং সমাজের কাছে মূল্যবান।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সঙ্কলন, ১ম খণ্ড এবং ২য় খণ্ড/ সম্পাদক—সুবীর রায়চৌধুরী/সহ সম্পাদক—অভিজিৎ সেন/দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩/প্রতি খণ্ড একশো টাকা

বিচিত্র মানসিকতার কিছু গল্প-উপন্যাস

বিজলি সরকার

সমস্ত সাহিত্যকর্মের মধ্যে উপন্যাস এমনই এক শিল্প মাধ্যম যার পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুতে নানা বৈচিত্র্যের সুযোগ রয়েছে। প্রকরণগত কৌশল যত অভিনবই হোক না, ঔপন্যাসিক যদি তাঁর কল্পনাসম্পৃক্ত বিশিষ্ট শিল্প-মানসিকতা দিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা পাঠকের কাছে বিশ্বাস্য করে তুলতে পারেন, তবে তিনি একজন সার্থক শিল্পী নিশ্চয়। আর উপন্যাসের মতো বিস্তৃত সুযোগ না থাকলেও পদ্ধতির নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় ছোটগল্প তো আজ অনেক বড়ো জমিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে নতুন না হলেও বিচিত্র মানসিকতার গল্প-উপন্যাস লেখার চেষ্টা যে অনেক হচ্ছে তা এই সব গল্প উপন্যাস পড়ে বোঝা যায়। সামুদ্রিক (সোমনাথ ভট্টাচার্য), মিছিল (নজরুল ইসলাম), খরা (শোভন সামন্ত), রাহুর দেশে (ফকির আশরাফ), পরবাসী (অধীর ঘটক), ডানাভাঙ্গার শব্দ (দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রথমেই মনে আসে সোমনাথ ভট্টাচার্যের উপন্যাস সামুদ্রিক-এর কথা। বাংলা গল্প উপন্যাসের জগতে সোমনাথ ভট্টাচার্য খুবই উল্লেখযোগ্য নাম। পঞ্চাশের দশক থেকে গল্প লিখছেন। লেখেন যদিও কম। ছোটগল্পে তাঁর অনন্যতা প্রথম থেকেই স্বীকৃত। সহজ স্বাচ্ছন্দ্যকেই তিনি পছন্দ করেন। আঙ্গিকের জটিলতায় না গিয়েও কাহিনী রসোত্তীর্ণ করে নেন।

ব্যক্তিগত জীবনে গ্রাম তথা মফস্বল জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত থাকার দরুণ সোমনাথ ভট্টাচার্য এই দুই জীবনের নানা অনুপুঙ্খ অত্যন্ত বাস্তবনিষ্ঠতায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। নরনারীর অন্তর্গূঢ় জটিল-কুটিল আবর্তে অবগাহন না করে তাদের প্রেম-অপ্রেম বিষয়ে বিচিত্র মানসিকতাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও টাটকাভাবে চিত্রিত করতে তিনি বেশি আগ্রহী। সামুদ্রিক এরকমই একটি জটিল অথচ সহজ পরিণামমুখী উপন্যাস।

সন্তান জন্মের এক বছরের মধ্যেই দীপান্বিতার স্বামী তপন তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তারপর "বারে বারে হাত বদল হয়েছে। তপনের পর তপনের বন্ধু নিমাইয়ের হাতে।" দুবছর বাদে আবার হাত বদল। "ভদ্রেশ্বরের কুণ্ডুদের যমজ দুই ভায়ের হাতে", এই যমজ দুই ভাই বড়কু-ছোটকু দীপান্বিতা ওরফে দীপাকে একটি চাকরিও জুটিয়ে দেয় তাদেরই ইন্টালির একদা বাগানবাড়ির অফিসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরাও টিকলো না। এরপর বগলা নাট্য সমাজের স্বত্বাধিকারী বগলা সাঁপুই-এর দলে যাত্রাভিনেত্রীর জীবন শুরু। তবে "শেষ হাত" যদিও বগলা সাঁপুই-এর হাতে তাকে থাকতেই হয়, কিন্তু এরই মধ্যে রূপেনের সঙ্গে দীপার সম্পর্ক শরীরে শরীরে হলেও একটু অন্য ধরনের। এই শহরের সবচেয়ে বনেদি মিত্র বাড়ির শিক্ষিত রূপবান রূপেন জীবনের নিঃসঙ্গতা ভুলে থাকতে স্বামী পরিত্যক্তা বহুপুরুষের হাতফেরতা দীপার সঙ্গে সব জেনে বুঝেই একটি সম্পর্ক গড়ে তোলে। রূপেনের স্ত্রী জয়া কেন গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে তার কারণ রূপেনের কাছে আজও রহস্যাবৃত্ত। স্ত্রীর স্মৃতি তার হৃদয়ের অনেক গভীরে। তাই দীপার সঙ্গে সম্পর্কে "রূপেন গভীরে যেতে চায় না। তাছাড়া রূপেনও তো জানে দীপার মনের গভীরে রয়েছে তপনের বসতি। তাই "এক নারীর বুকে মাথা রেখে একপুরুষ অন্য এক নারীর জন্যে চোখের জলে বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে।" দীপাও "আঁকড়ে ধরেছে রূপেনের মাথা। বুকের মধ্যে অন্য এক পুরুষের মুখ। জীবনের প্রথম পুরুষ।" তার সন্তানের বাবা। বাড়ির অমতে তপনের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল দীপা। ছেলে অমিত যাকে বাধ্য হয়েই দূরে দার্জিলিংএ পড়াশুনার অজুহাতে সরিয়ে রাখতে হয়েছে। সন্তানের কথা ভেবেই দীপার চোখে বাষ্পের মেঘ কিছুতেই দূর হয় না। দীপা "এখনো তপনের খবরাখবর মোটামুটি নিয়মিত রাখে-পায়।" সন্তানের জন্য একবার সে তপনের মুখোমুখি হতে চায়। তাই রূপেন যখন তাকে নিয়ে ঝাউখালি যাবার কথা বলল, দীপা এককথায় রাজি হয়ে গেল। কেননা দীপা জানতো এইসময় তপন কনট্রাকটারির কাজে ঝাউখালিতে রয়েছে। দীপা "পনেরো বছর পর একবার দেখতে চায় তার জীবনের প্রথম পুরুষটিকে। অর্থবান, সফল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসারী সেই মানুষটিকে।" রূপেনও জানতো ঝাউখালি যেতে দীপার আসল আগ্রহের রহস্যটি। কিন্তু দীপাকে বুঝতে দেয়নি সে কথা। অবশেষে দীপা তপনের মুখোমুখি হল। "দারুণ অভ্যর্থনা জানালো" তপন। "কতো কথা! কতো জিজ্ঞাসা।" কিন্তু "তপন একবারও অমুর কথা জিগ্যেস করলো না", বুক ভাঙা হাহাকারে রূপেনের কাছে দীপা ভেঙে পড়ল। হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত রুগির মতো দীপা ক্রমাগত বলে চলে "আমি তো অমুর পিতৃত্বের দাবি নিয়ে ওর কাছে যাইনি। কিন্তু এক মার কাছে তার সন্তানকে কেন অস্বীকার করবে ও রূপ? কেন করবে?"

উপন্যাসটির চমৎকারিত্ব এখানেই। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাধারণত পিতৃপরিচয়ই একজন মায়ের কাছে একান্ত জরুরী। তার মাতৃত্বের স্বীকৃতি অবলুপ্ত হয়ে গেলেও। সমাজ তথা মায়ের কাছে এটাই ঈপ্সিত বস্তু। কিন্তু দীপা এখানে তার ছেলের পিতৃপরিচয়ের দাবি নিয়ে স্বামীর কাছে যায়নি। সে চেয়েছিল তপন তার ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করে দীপার মাতৃত্বকে মর্যাদা দেবে। কিন্তু তার স্বামী ছেলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে দীপার মাতৃত্বের চরম অবমাননা করেছে। একজন মা হিসেবে

এই অপমানভার দীপার কাছে তার সমস্ত জীবনের বঞ্চনা আর গ্লানিময় জীবনযাপনের ক্ষত তুচ্ছ হয়ে যায়। দীপার লাঞ্ছিত বেদনাহত করুণ মূর্তি রূপেনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। সে হাত বাড়িয়ে দেয় দীপার দিকে। এক "ভিন্নমুখী স্রোত ঠেলে, লবণাক্ত জলের ঝাপটায় অন্ধ চোখে পরস্পরের অপমান, যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতাকে স্পর্শ করার জন্যে এই হাত বাড়িয়ে দেওয়া! — প্রেম কি এই?" দুটি নরনারীর স্মৃতিতাড়িত মনের জটিল অনুভূতির সুন্দর রূপায়ণ এই সামুদ্রিক উপন্যাসটি। তবে এটি উপন্যাস হলেও এর মধ্যে ছোটগল্পের স্বভাবই যেন ফুটে উঠেছে।

মোট একুশটি গল্পের সংকলন নজরুল ইসলামের 'মিছিল'। উদ্যমী সৎ আদর্শবান ছেলে বকুল। উন্মেষ থেকে পরিণতি পর্যন্ত বিকশিত বকুলের মানসিক ও সামাজিক চরিত্রটির ক্রমউন্মোচন নিয়ে বেশির ভাগ গল্প। দরিদ্র চাষী ঘরের ছেলে বকুল একবেলা আধপেট খেয়েও লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু লেখাপড়া শিখেও সে চাকরি পায় না। বাবা মা ভাই-এর কথা ভেবে বকুল অস্থির হয়। উপায়ান্তর না দেখে শেষপর্যন্ত 'অনিশ্চিতের পথে' পা বাড়ায়। মাত্র একশো টাকা মাইনের টিউশনির জন্য সুদূর তারকেশ্বরের কোনো এক গণ্ডগ্রামে চলে সব স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করেই। কিন্তু অভিভাবকদের অশিক্ষা আর কুরুচিপূর্ণ মানসিকতায় সেখানে বেশিদিন টিকতে পারল না। গরিবের প্রতি ধনীর মজ্জাগত ঘৃণা বকুল টের পায় মর্মে মর্মে। 'বিপ্লবমাষ্টার যেন তার মনে কথা' বলে। "আমি প্রাণ দেব তো ধান দেব না।" আর "এই জন্যই বকুলের লাল পার্টির মিটিঙে আসতে ভাল লাগে।" কিন্তু মিটিঙে এসে বকুল অবাক হয়ে যায় স্টেজে রাম বাড়ুয্যেকে দেখে। "রামবাড়ুয্যে তো নীল পার্টির লোক; আমাদের মিটিঙে কেন? আমাদের লড়াইটা তো ওদের বিরুদ্ধে, ওরা আমাদের মিটিঙে এলে আমরা লড়ব কার সাথে?"

এভাবে ঠোক্কর খেতে খেতে বকুলের আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের ফারাক ক্রমেই বাড়তে থাকে। সে একজন আদর্শ পুলিশ অফিসার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও কখনওই তা পারে না সমাজের হর্তাকর্তাদের চাপে। তাই বকুল যখন নিরপরাধ রিক্সাওয়ালা অমলকে মিথ্যে খুনীর আসামী হিসেবে জেলবন্দী না করে সত্যিকারের খুনী সমাজের মাথা ধনী অতুলবাবুকে ধরবার তোড়জোড় করে তখনই "জনস্বার্থে তাকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।"

এসব ছাড়াও এই গল্প সংকলনে আরো কয়েকটি অন্য ধরনের গল্প আছে। যেখানে বকুলের জীবনে প্রেমের উন্মেষ এবং প্রেমের ব্যর্থতার টানাপোড়েন অব্যর্থ হয়ে উঠেছে। আছে গৃহস্থ বাড়ির কাজের মেয়ে সবেজানের বিড়ম্বিত জীবনের করুণ কাহিনী।

নজরুল ইসলাম কেবল গল্পকার হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত নন, তিনি একজন সুদক্ষ পুলিশ অফিসার এবং তাঁর সততা ও সাহসের নানা কাহিনী আমাদের কাছে প্রায় কিংবদন্তীর মতো। কর্মজীবন সূত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন। সেই হিসেবে তাঁর গল্প বাস্তবতার শক্তি জমিতে শেকড় ছড়াতে পেরেছে। শিল্পের জটিলতার মধ্য দিয়ে পরিবেশিত না হয়ে কেবল অভিজ্ঞতা পরিবেশনের অতি ঝোঁকের ফলে তার গল্পে পাঠক অনেক সময় আকর্ষণ হারিয়ে ফেলতে পারেন। তবুও নজরুল ইসলামের গল্প পাঠকদের কাছে তৃপ্তিকর হবে বলেই আশা করা যায়।

চরিত্র, ঘটনা এবং অনুভব এই তিন বিষয়কে কেন্দ্র করে গল্প গড়ে উঠেছে শোভন সামন্তর 'খরা'য়। মোট গল্প দশটি। প্রথম গল্পটির নাম খরা। খুবই বলিষ্ঠ গল্প। পটভূমি সুন্দরবনের বাদা অঞ্চল। চৈত্র মাসের প্রচণ্ড দাবদাহে সমস্ত তল্লাট আগুনের গোলা হয়ে আছে। খরার গর্ভে সবই গেছে। কারো ঘরে এক কানাকড়ি দানাপানি নেই। রোজগারের কোনও পথ খোলা নেই। চারিদিকে হাহাকার। "হরদম ঝিমোয় নিরু মণ্ডল। অন্ন নেই ঘরে, কামকাজেরও আকাল। শেষভরসা এই তট রাক্ষসখালীর আড়পারের খেয়াঘাট।" অথচ এই অঞ্চলের জোতদার মহাজন নিতাগুড়িয়া যখন "ফের বলল, জরুরি দরকারে ডেকেচ্যান বড়বাবু। না গেলে খুব ক্ষতি হবে। তুই পার করে দে, আমি তোরে সারা খরার মরশুমটায় দেখবু'। 'হাতে এমন স্বর্গ পেয়েও নিরুমণ্ডল নীরব কাঠিনো জোতদার নিতা গুড়িয়াকে প্রত্যাখ্যান করে। তার দোষের মধ্যে দোষ — বলেছিল "বৌটি তো খাসা করিচিস নিরু আর ভোগও করচিস অ্যাদ্দিন একা একা।" কথা শেষ করার অবকাশ মিলবার আগেই তল্লাটের সবচেয়ে মহাজন মানুষটি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল একহাট মানুষের সামনে নিরুর "পুরুষ্টু পাথুরে দুখান হাতের" দাপটে। কিন্তু সর্বগ্রাসী খরা শেষপর্যন্ত নিরুর 'পাথুরে' হাত দুটিকেও রেহাই দিল না। সেদিন নিরুর কাছে সব "ঝাপসা, অস্পষ্ট। পষ্ট শুধু খিদের সেই মহাজাগতিক বোধ।" ক্ষুধাক্লিষ্ট ভাঙচুর শরীরটা নিয়ে ঘরে ফিরে বৌকে না পেয়ে রান্না ঘরে "কলাই করা ডিস আর বাটিতে" "ভাত, ডাল, আলুভাজা, মাছের ঝোল" দেখে কোন আর কিছু চিন্তার শক্তি পায়নি নিরু। "সবটুকু চেটেপুটে" ডাকল "পুষ্প ... পুষ্প।" ততক্ষণে নিতা গুড়িয়া বলতে শুরু করেছে "কোনও দুশ্চিন্তা নেই আর তোদের। আমিই বাঁচায়ে দুবু এ খরায়। শুনলই শুধু নিরু"। খরায় অনেকের অনেক কিছুই গেছে কিন্তু নিরুর গেছে "একমাত্র গ্রাহ্য সম্পত্তি জীবনে। তার শক্ত সমর্থ হাত দুটি। তার সর্বস্ব।..."

খরাকে উপলক্ষ করে গল্পের এই তীক্ষ্ণ পরিণতি যেন নগ্ন বাস্তবের শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছে।

শোভন সামন্তর এই সংকলনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'সুখ'। মল্লিকপুরের বিধবা বৃদ্ধা রতনমনি বাজারের দোকানে দোকানে জল বয়ে দিয়ে, ব্যাঙ্কের ঘর ঝাটপাট দিয়ে যা সামান্য পায় তা সবই যক্ষের মতো জমিয়ে রাখে তার ভাঙা ঘরে টিনের বাক্সে। সবারই কৌতূহল বুড়ির জমানো টাকায়। একদিন দেখা গেল রতনমনির টাকা সব চুরি গেছে। ব্যাঙ্কে কেন টাকা রাখেনি পুলিশের এই প্রশ্নে রতনমনির বিস্মিত জবাব — "দেখতিই যদি না পাই দু'চক্ষু ভরে, রোজ সকাল সন্ধ্যে"! অবশ্য ভাঙাচোরা শরীরটাকে টেনে টেনে রতনমনি আবার দশ পয়সা পাঁচ পয়সা করে তার টিনের ভাঙা বাক্সে জমিয়ে তুলতে শুরু করে জীবনের একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু — তিল তিল করে জমিয়ে তোলা টাকাপয়সার স্পর্শসুখ।

অধীর ঘটকের 'পরবাসী' উপন্যাসটি একটি সাঁর কারখানার কর্মচারি থেকে মালিক ম্যানেজার অফিসার সকলেরই নৈতিক ও চারিত্রিক উত্থানপতন নিয়ে লেখা। অশোক মিত্র এই কারখানার সংযোগ অফিসার হিসেবে "লণ্ডন থেকে সোজা চলে এসেছিল" কেবলমাত্র স্বদেশের টানে। কিন্তু এখানকার পরিবেশ, বিশেষ করে সহকর্মী ও মালিকের ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে না পেরে, নিজের আদর্শ ও কর্তব্যের টানাপোড়েনে বার বছর কাটিয়েও শেষ পর্যন্ত তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হয় লণ্ডনে "নিজবাসে। প্রবাসে।"

সামুদ্রিক — সোমনাথ ভট্টাচার্য/আনন্দ পাবলিশার্স/১৮ টাকা
মিছিল — নজরুল ইসলাম/ভাষা ও সাহিত্য/২৫ টাকা
খরা — শোভন সামন্ত/অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ/২০ টাকা
পরবাসী — অধীর ঘটক/অভিযাত্রী/৩৫ টাকা

রাজনৈতিক শ্রমিকের খোঁজে

তিমির বসু

শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। অবিভক্ত বাংলায় বিশেষ করে স্বাধীনতার প্রাকমুহূর্তে শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বামপন্থী মহলে তথা অ-বামপন্থী রাজনীতির চৌহদ্দিতে এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের লেখা রয়েছে। নির্বাণ বসুর আলোচনার বিষয়বস্তু স্বাধীনতার এক দশক আগে শ্রমিক রাজনীতির সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক। যদিও সময়সীমা ধরা হয়েছে স্বাধীনতা-পূর্ব এক দশক, আলোচনার ব্যাপ্তি রয়েছে যথেষ্ট গভীরে, অনেক বেশি সময় জুড়ে।

শ্রী বসু বাংলার অর্থাৎ কলকাতার শ্রমিকের বিশেষ করে সংগঠিত শ্রমিকের শ্রেণী অবস্থান সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবার বিশেষ কোন অবকাশ নেই। বর্তমান প্রতিবেদকের এই সত্তরদশকেও ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন করতে গিয়ে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সঙ্গে চল্লিশের কিম্বা তিরিশের দশকের পরিস্থিতির খুব একটা ফারাক আছে বলে মনে হয় না। এদেশে শিল্প শ্রমিকের দ্বৈত চরিত্র রয়েছে। রয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত মূল্যবোধ। জমির সঙ্গে আত্মিক যোগ শ্রমিকের সেদিন যেমন ছিল আজও তেমনিই রয়েছে যদিও অঞ্চল বিশেষে সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে। মার্কস এবং লেনিন বর্ণিত সর্বহারারা এদেশে এখনও বোধহয় সবকিছু হারায়নি। কলকাতার শিল্প-শ্রমিক আবার ছোট বা প্রান্তিক চাষীও বটে। অদক্ষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে সেদিন মূল সমস্যা ছিল তাদের নাড়ীর টান ভিন্ প্রদেশে। আজ সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে তবুও ভিন্ রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল। শুনতে খারাপ লাগলেও বাস্তব সত্য হচ্ছে এরা কিছুতেই বাংলামুলুককে নিজেদের বাসস্থান বলে ভাবতে পারে না। এখানকার সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় গভীরভাবে একাত্ম হবার ক্ষেত্রে বাধা অনুভব করে — ফলে দীর্ঘ চল্লিশ বছর কলকাতায় কিম্বা হাওড়ায় কর্মজীবন অতিবাহিত করবার পরও এরা শুরুতে যে দূরত্ব বজায় রেখেছিল, শেষদিনেও সেই অবস্থান থেকে দূরে সরে আসেনি। একবার কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের এক বিহারী শ্রমিক ব্যাপারটা খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিল — "মজফফরপুর সে পার্সেল যেইসে আয়া, পার্সেল ফিন ঐসে আপস চলা গিয়া।" এইসব শ্রমিকের আন্দোলনে ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা কম। 'বঙাল মে আয়া কামানে কে লিয়ে — এই মানসিকতা অতিসংগঠিত শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে আজও পরিলক্ষিত হয়। তাই বলে ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য নেই এমন কথা বলা যাবে না। চাকুরিতে নিজের ভাই-ভাতিজা-কে ঢোকার জন্য সরকারে আসীন পার্টি নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্যের মাত্রাটা ক্ষেত্রবিশেষে বেশিই বলতে হবে। ফলে বিশ্বকর্মা পুজো বহুজায়গাতে সাহেব পুজো অর্থাৎ বাবুপুজো জাতীয় কালচারে পর্যবসিত হয়েছে।

জমির সঙ্গে একধরনের শ্রমিকের সম্পর্ক এতই নিবিড় যে বিহারের গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত-মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন এদের দুশ্চিন্তার কারণ। প্রকৃতপক্ষে এরা এই ধরনের আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা করে। এদের পক্ষে ছাঁটাই কিম্বা লক আউট নিয়ে খুব দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম গড়ে তোলা কখনই সম্ভব নয়। আর বৃহত্তর কোন রাজনৈতিক সমস্যা এদের কাছে বাবুদের বিলাসিতার সামিল। ইদানিংকালে বন্ধ কারখানার গেটে ত্রিপল খাটিয়ে যারা বসে থাকে তাদের বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু শ্রমিক। এদের আর গ্রামে ফিরে যাবার জায়গা নেই। নির্বাণ বসুর আলোচ্যবিষয় শ্রমিকের শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত নয়, ফলে এই বিপুল অরাজনৈতিক

শ্রমিকশ্রেণী কীভাবে জাতিপ্রথা দ্বারা প্রভাবিত তার আলোচনা নেই। কলকাতার বহিরাগত শ্রমিকদের মধ্যে যারা সংগঠিত শিল্পে রয়েছে তাদের অধিকাংশ উচ্চবর্ণের আর অসংগঠিত শিল্পের অগণিত শ্রমিকরা হচ্ছে তথাকথিত নিম্নবর্ণের — বিহার কিম্বা উত্তরপ্রদেশের গ্রামের শ্রেণীসংঘাত তথা জাতিগত সংঘাত এবং বিদ্বেষ এরা এদের নতুন কর্মস্থলেও বয়ে নিয়ে আসে। সুতরাং জাতিভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন এই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গেও শেষ প্রান্তেও বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গেও যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক মনে হচ্ছে। কাঁসিরামের বিপরীত সাম্প্রদায়িকতা প্রগতিশীল বলে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে রাজনৈতিক আন্দোলন, বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন পাশাপাশি চলেছে দুটো সমান্তরাল ধারার মতো। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীকে সামনের সারিতে আনতে চায়নি। জাতীয় কংগ্রেস শ্রমিক সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা থেকে বিরত থেকেছে। কমিউনিস্টরাও চিরাচরিত প্রথায় দরকষাকষি ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীকে কখনই রাজনৈতিক নেতৃত্বের দাবীদার হিসেবে দেখেনি যদিও দলিল দস্তাবেজে ধ্রুপদী মার্কসীয় সাহিত্যের উপর ভিত্তি করে রচিত তাদের কর্মসূচীতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নটা প্রায় ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো প্রতিফলিত হয়েছে। ঘটনা হচ্ছে মধ্যবিত্ত প্রভাবিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলো আজও শ্রমিক আন্দোলনে মাগ্‌গী ভাতা কিম্বা বোনাস নিয়েই সোচ্চার। আর অতি সম্প্রতি ডাঙ্কেলসাহেবের কল্যাণে উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে কিছু মেঠো বক্তৃতা শোনা যায়। রাজনীতির আলোচনা কিছুটা 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ঢঙে শ্রমিক-অশ্রমিক সবার মিলিত সভায় করা হয়ে থাকে।

লেখক কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে শ্রমিক ধর্মঘটের যেগুলোর চরিত্র ছিল মূলত রাজনৈতিক। ১৯৩৭ সালের মে মাসে চটকল শ্রমিক ঐতিহাসিক ধর্মঘট এই পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু এইসব ঐতিহাসিক ধর্মঘট কিছুটা তাৎক্ষণিক ব্যাপার। এর দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনে কোন দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। সূচিত হয়নি কোন গুণগত পরিবর্তন। অথবা বলা ভাল নেতৃত্বদানকারী পার্টিগুলো বরাবরই শ্রমিক আন্দোলনকে নিজেদের সীমিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার উপায় হিসাবে সাময়িকভাবে ব্যবহার করেছে।

যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছিল সন্দেহ নেই। শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানও বেড়েছিল, বেড়েছিল দরকষাকষির কার্যকরী ক্ষমতা। কিন্তু যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন বিকশিত হবার সুযোগ থাকলেও ট্রেডইউনিয়ন নেতৃত্ব মূলত অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে পারেনি। ট্রেডইউনিয়ন যেন অনেকটা দোকানদারি। অবশ্য আজও অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। ব্যাপারটা এখনও দোকানদারি। অফিসে মার্কস, লেনিন অথবা গান্ধী মহারাজের ছবি টাঙানো থাকে এই যা। প্রসঙ্গত লেখক ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের দাবীদাওয়ার প্রকৃতি নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনা করেননি যদিও বহিরাগত শ্রমিকের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাবোধ কাটাবার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার একটা সুসংহত রূপ একেবারেই অসম্ভব ছিল না। কলকাতা বন্দর মরে যাচ্ছে, আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য প্রতিবছরই কমছে, কমছে শ্রমিক সংখ্যাও। অথচ বন্দর বাঁচাবার জন্য কোন রাজনৈতিক দলের ইউনিয়নই কখনও শ্রমিকদের আহ্বান করেনি। ভাবখানা এই — ওটা কর্তৃপক্ষের ব্যাপার, শ্রমিকরা আর্থিক সুবিধা আদায় করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। বন্দরই যদি না থাকে তাহলে মাগ্‌গী ভাতার সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে হবে বোঝা মুশকিল। জনৈক বামপন্থী বন্দর শ্রমিক নেতা একবার বর্তমান প্রতিবেদকের কাছে এ ব্যাপারে ইউনিয়ন নেতৃত্বের ব্যর্থতা স্বীকার করেন। তার মতে এক ধরনের স্থবির চিন্তা এখনও শ্রমিক আন্দোলনের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। স্থিতাবস্থা ভাঙার কথা উঠলেই সবাই আঁতকে ওঠে।

উপসংহারে লেখক শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্তসারে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। লেখকের মতে ১৯৪৫-৪৭ সালে জঙ্গী ধর্মঘট হয়েছে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সোচ্চার হয়নি। এমনকি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব কখনই শ্রমিকশ্রেণীকে ব্রিটিশরাজ উৎখাতের জন্য উৎসাহিত করেনি। এর কারণটা অবশ্য লেখক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেননি। ভারতীয় শিল্পপতি এবং বণিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় কংগ্রেস এবং ব্রিটিশের সহযোগী মুসলিম লীগ কখনই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এ কাজে বিরুদ্ধে সক্ষম ছিল না তাদের শ্রেণীস্বার্থের জন্যই।

কোন কোন বিষয়ে পুনরুক্তি অবশ্য অনেকের বিরক্তির কারণ হতে পারে। মনে হয় আরও স্বল্প পরিসরে লেখক তার বক্তব্য হাজির করতে পারতেন। যারা শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহী তাদের কাছে নির্বাণ বসুর গবেষণামূলক এই বই-এর গুরুত্ব রয়েছে নিঃসন্দেহে।

The Political Parties and the Labour Politics 1937-1947 — Nirban Basu/Minerva Associates (Publications) Pvt. Ltd./7-B, Lake Place: Calcutta 700 029/Rs. 145

স্ট্যান্ডার্ড বাংলা উচ্চারণ বিধিবদ্ধ করার সমস্যা

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

ভাষা হিসাবে বাংলার উদ্ভব যেসব শব্দ নিয়ে তার পারিভাষিক নাম তদ্ভব। এইসব শব্দের মূল যদিও সংস্কৃত, কিন্তু প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে সেগুলি নতুন চেহারা পেয়েছে। এধরনের শব্দের বর্ণরূপের সঙ্গে ধ্বনিরূপের মোটামুটি সাজুয্য আছে। তবে বাঙালির উচ্চারণের হ্রস্বপ্রবণতা আর অল্পপ্রাণতার লক্ষণ ওইসব শব্দে ধরা পড়ে।

বাংলাভাষা জন্মসূত্রে পেয়েছে প্রচুর তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এইসব শব্দের বর্ণরূপের সঙ্গে ধ্বনিরূপের মিল সামান্য। দ্বেষ আর দেশ শব্দদুটির উচ্চারণে কোনও ভিন্নতা নেই। যক্ষ কল্পনা প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতে বা হিন্দিতে যেভাবে উচ্চারিত হয় তার সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের দুস্তর তফাত। রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধার করে বলতে পারা যায়: 'বাংলা ভাষার উচ্চারণে তৎসম শব্দের মর্যাদা রক্ষা হয় বলে আমি জানি নে। কেবলমাত্র অক্ষর বিন্যাসেই তৎসমের ভান করা হয় মাত্র, সেটা সহজ কাজ। বাংলা লেখায় অক্ষর বানানের নির্জীব বাহন — কিন্তু রসনা নির্জীব নয় — অক্ষর যাই লিখুক, রসনা আপন সংস্কারমতই উচ্চারণ করে, চলে। সে দিকে লক্ষ করে দেখলে বলতেই হবে যে, অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি, সেই সকল শব্দের প্রায় ষোলো আনাই অপভ্রংশ।' রাজশেখর বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতেও ওই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় — 'ভেবে দেখলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই। যাকে তৎসম শব্দ বলি উচ্চারণের বিকারে তাও অপভ্রংশ পদবিতে পড়ে। সংস্কৃত নিয়মে লিখি সত্য কিন্তু বলি শোত্তো। মন শব্দ যে কেবল বিসর্গ বিসর্জন করেছে তা নয় তার ধ্বনিরূপ বদলে সে হয়েছে মোন্।'

বাংলা বানানের সঙ্গে উচ্চারণের — অর্থাৎ বর্ণরূপের সঙ্গে ধ্বনিরূপের — এই যে অসামঞ্জস্য তাকে বিজ্ঞানের আধুনিক পরিভাষায় জেনেটিক বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যাত করা চলে। আর এই বৈশিষ্ট্য শুধু বাংলাভাষার ক্ষেত্রেই একান্ত তাও নয়। তবে উচ্চারণবৈষম্য ব্যাপারটা বাংলায় নানা কারণে জটিল হয়ে উঠেছে। আজ বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী প্রধানত দুটি রাজনৈতিক ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ। বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, তার রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলাভাষীর বড় তরফ ওই বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গ হল ভারতরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য যেখানকার প্রধান ভাষা বাংলা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী ত্রিপুরাতেও বাংলার প্রচলন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার মাতৃভাষাকে যেন নতুন করে পেয়েছে। একটা স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণরীতি গড়ে তোলার দিকে সতত প্রয়াস চলেছে সেখানে। পশ্চিমবঙ্গেরও একটা স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণরীতি গড়ে উঠেছিল কলকাতার সম্ভ্রান্ত উচ্চারণকে কেন্দ্র করে। তবে দেশভাগের পর কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গীয় স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণেও বেশ রদবদল ঘটে গেছে। একটা অভিঘাত একটা মিশ্রণ পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণ প্রক্রিয়াকে নতুন রূপ দিয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে যে উচ্চারণকে পশ্চিমবঙ্গের স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ বলে মানা হত এখনকার উচ্চারণ তার থেকে অনেকটা সরে গেছে। সেই সঙ্গে উভয় বাংলার স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণে একটা সমতা আনার সচেতন প্রয়াসও লক্ষ করা যাচ্ছে।

স্ট্যান্ডার্ড বা প্রমিত বা মান্য বাংলা উচ্চারণ বিধিবদ্ধ করার জন্য দুই বাংলাতেই যে চেষ্টা চলছিল তার ফলস্বরূপ সম্প্রতি কয়েকটি অভিধান সংকলিত হয়েছে। ঢাকা একাজে এগিয়ে রয়েছে। সেখানকার সর্বাধুনিক উচ্চারণ অভিধানটির রচয়িতা নরেন বিশ্বাস। প্রকাশক ঢাকার বাংলা একাডেমী। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাহিত্য সংসদ প্রকাশ করেছেন সুভাষ ভট্টাচার্যের প্রস্তুত উচ্চারণ অভিধান। উভয় অভিধানকারই এই কাজের পক্ষে যোগ্য ব্যক্তি। নরেনবাবু সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলা উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণায় নিরত আছেন। একাগ্র নিষ্ঠায় প্রচুর পরিশ্রমে তিনি শব্দ সংকলন করেছেন। অভিধানে উচ্চারণপদ্ধতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনাও করেছেন। উচ্চারণ নির্দেশে বারবার গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ আবদুল হাই প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের কথা। আর তাঁর শিক্ষাগুরু আনিসুজ্জামান তো নরেনবাবুকে পূর্বাপর প্রেরণা জুগিয়েছেন। অন্যদিকে সুভাষবাবুও বিভিন্ন ধরনের অভিধান রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন বহুদিন ধরে। তাঁর উচ্চারণ অভিধানটিতে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক সংকেতচিহ্ন ব্যবহৃত হওয়ায় এটির উপযোগিতা বেড়ে গেছে। এছাড়া বাড়তি হিসেবে তিনি শব্দার্থও দিয়েছেন। উচ্চারণরীতির ব্যাপারটি সুভাষবাবু সংক্ষেপে সেরেছেন। তাই দু'টিই উচ্চারণ অভিধান হলেও একটি আর একটির থেকে স্বতই আলাদা ধরনের। নরেনবাবুর সংকলনে সুভাষবাবুর চেয়ে শব্দসংখ্যা বেশি।

নরেনবাবু বিশেষ একটি উচ্চারণপদ্ধতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে সেই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উচ্চারণে পার্থক্য বিদ্যমান এবং বাংলাদেশের উচ্চারণপ্রবণতাই অনেক বেশি মূলানুগ। এই মনোভাব অন্য উচ্চারণের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। এটা স্বাভাবিকও বটে।

উচ্চারণ নিয়ে ধন্দ এতই প্রবল যে অভিধানদু'টি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কেবলই যেন না-সূচক ঘাড় নাড়তে ইচ্ছে করে। অভিধানকারের নির্দেশিত উচ্চারণকে স্ট্যান্ডার্ড বলে স্বীকার করতে

না পারলে কিংবা নাকচ করতে পারলেই যেন খুশি হই। কিন্তু সে-সুযোগ বড় একটা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘাড় নেড়ে বলতে হয় : ঠিক ঠিক। তবে নরেনবাবুকে বলি তাঁর অভিধানে ঋ-কারের উচ্চারণ বোঝাতে ঋ-ফলার জায়গায় র-ফলা ই-কার (মৃত্যু= মৃত্তু না লিখে ম্রিত্তু) লিখলেই ঠিক হত। অনুস্বরের উচ্চারণ নির্দেশ 'ঙ'-র বদলে 'ং' দিয়ে করাটাও বিধেয় ছিল। বাঙলা বাঙলো শব্দে ঙ-র উচ্চারণ হলন্ত হলেও লাঙল ভাঙন ভাঙড় শব্দে ঙ কিন্তু স্বরান্ত। সুভাষবাবুকে জিজ্ঞেস করি, আগত নত আনীত এইসব শব্দের ত-ধ্বনি কি ও-আশ্রিত না অ-আশ্রিত। এ সংশয় থেকে অবশ্য উদ্ধার নেই।

অভিধানে যেমন নির্দেশই থাক না কেন খাশ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অবধি বয়স সময় হ্রাস হ্রস্ব শব্দগুলি পড়বার বা বলবার সময় উচ্চারণ করতে চাইবেন ওব্‌দি বএশ্‌ শোমায়্‌ রাশ্‌ রশ্‌শ। সুভাষবাবু ও নরেনবাবু দু'জনেই অবধি-কে অবোধি উচ্চারণ করেছেন এবং অব্দি শব্দের উল্লেখই করেননি। সুভাষবাবু বয়স বয়েস দু'টি শব্দ নিয়েছেন, নরেনবাবুতে বয়েস মিলবে না। সময়-কে শময়্‌ বা শোময়্‌ বলা হয়েছে। হ্রাস আর হ্রস্ব-কে নরেনবাবু যদি দেখান হ্রাশ্‌ আর হ্রশ্‌শো তাহলে সুভাষবাবুতে পাই র্‌হাশ্‌ আর র্‌হশ্‌শো।

বড় গোল বাধে অদ্য, কথ্য, গণ্য প্রভৃতি শব্দ নিয়ে। অনেককেই উচ্চারণ করতে শুনি অদ্‌দ কত্‌থ গন্‌ন। কিন্তু দুই অভিধানকারই একমত হয়ে উচ্চারণ দেখিয়েছেন ওদ্‌দো কোত্‌থো গোন্‌নো। অভিধান নির্দেশিত উচ্চারণ ভাষাবিজ্ঞানসম্মত। আবার সম্ভ্রান্ত উচ্চারণের এই চেষ্টাকৃত ভিন্নতাকে কি অগ্রাহ্য করা সমীচীন হবে? তেমনি সংশয় জাগে চর্যাপদ (চোরজাপদ্‌) জনগণ (জনোগন্‌), জননী (জোনোনি), করতল (করোতল্‌) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ নিয়ে।

একতা একাকী শব্দদু'টির দু'টি করে উচ্চারণ দুই অভিধানে দেখানো হয়েছে। তবে বাংলাদেশ যেখানে স্বাভাবিকভাবেই একোতা ও একাকি-কে প্রথমে এনেছেন, পশ্চিমবঙ্গে সেই জায়গা পেয়েছে অ্যাকোতা ও অ্যাকাকি।

উদ্যোগ আর উদ্যোগী শব্দদুটির উচ্চারণ দুই অভিধানকারই দেখিয়েছেন উদ্‌দোগ্‌ ও উদ্‌দোগি। তবে নরেনবাবু বিকল্পে উদ্‌জোগ্‌ ও উদ্‌জোগি রেখেছেন। সুভাষবাবু উদ্‌যোগ বলে একটি মুখশব্দে অবশ্য উচ্চারণ উদ্‌জোগ্‌-এর সঙ্গে উজ্‌জোগ্‌ যোগ করেছেন।

ব্রহ্ম আর ব্রাহ্মণ শব্দদুটির উচ্চারণ নরেনবাবুতে ব্রোম্‌হো আর ব্রাম্‌হোন্‌, সুভাষবাবু দেখাচ্ছেন ব্রোম্‌ম্‌হো আর ব্রাম্‌ম্‌হোন্‌। তবে আমরা সাধারণত শুনি ব্রোম্‌ভো আর ব্রাম্‌ভোন্‌।

আহ্বান (আওভান্‌) আহ্বায়ক (আওভায়োক) জিহ্বা (জিউভা) গহ্বর (গওভর্‌) প্রভৃতি শব্দের বেলায় দুই অভিধানকারই সহমত পোষণ করেন। জল্লাদ-কে দু'জনেই জল্‌লাদ্‌ বলেছেন। কিন্তু আহ্লাদ-এর উচ্চারণ নরেনবাবুতে আল্‌হাদ্‌ হলেও সুভাষবাবুতে দে'ওয়া হয়েছে আল্‌ল্‌হাদ্‌ ও আল্‌লাদ্‌। পরিত্যক্ত একজন উচ্চারণ করেন পোরিত্‌ত্যাক্‌তো, অন্যজন পোরিৎতক্‌তো।

আবৃত্তি স্মৃতি স্বীকৃতি শব্দগুলির উচ্চারণ কেমন হবে? ভিন্ন ভিন্ন বানানে লিখলেও দুই অভিধানকার রায় দিয়েছেন আব্রিত্‌তি স্রিঁতি ও শিক্রিতির পক্ষে। নরেনবাবু শিক্‌ক্রিতি-কেও স্বীকার করেছেন।

কিন্তু পদ্ম আত্মা এসব শব্দের বেলায় পূর্ব পশ্চিমে পুরো মিল হয়নি। নরেনবাবু যেখানে উচ্চারণ নির্দেশ করেন পদ্‌দোঁ ও আত্‌তাঁ সেখানে সুভাষবাবু ওগুলিকে বিকল্প বলে মেনে নিলেও পছন্দ করেছেন পদ্‌দো ও আঁৎতা উচ্চারণ।

তাই মনে হয় বারবার যাচাই করা দরকার বাঙালির উচ্চারণ প্রক্রিয়া। একটা মান্য বা প্রমিত উচ্চারণের শাসন কায়েম করা সহজ কাজ নয়। তবু বিধিবদ্ধ নিয়মে একটা উচ্চারণ রীতি গড়ে তোলার পক্ষে এই দুটি অভিধান বিশেষভাবে সাহায্য করবে — একথা অকুণ্ঠ চিত্তে ঘোষণা করা চাই। নরেন বিশ্বাস আর সুভাষ ভট্টাচার্য দু'জনেই এবং তাঁদের প্রকাশকরা বাঙালির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ইতিপূর্বে এই ব্যাপারে যেসব কাজ হয়েছে এই দু'জন সংকলক তাদের থেকে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছেন, অভিধানদু'টির পরবর্তী সংস্করণগুলির গ্রহণযোগ্যতা অনেকগুণ বেড়ে যাবে, এ আশা রাখি।

বাংলা একাডেমী বাঙলা উচ্চারণ অভিধান: নরেন বিশ্বাস/ বাংলা একাডেমী, ঢাকা/ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩/ ১৫০ টাকা

সংসদ বাংলা উচ্চারণ অভিধান: সুভাষ ভট্টাচার্য/ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা/ জানুয়ারি, ১৯৯২/ ১০০ টাকা

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস জন্মশতবার্ষিকী

বারিদবরণ ঘোষ

খুব নীরবে, প্রায় অজ্ঞাতসারেই একটা বড় মাপের মানুষের, এক বিশ্বপরিব্রাজকের জন্মশতবর্ষের বিশেষ দিনটি পার হয়ে গেল। দু-একজন একান্ত অনুরাগী তাঁকে হয়ত স্মরণ করেছেন, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের স্মৃতি থেকে তিনি যেন অপসারিত। তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন — এমন মানুষের সংখ্যা অজস্র। কারণ পুরো চল্লিশটা বছর এখনও পার হয়নি তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন। আর তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর পাঠকেরা তো প্রচুর সংখ্যায় আমাদের মধ্যে বর্তমান। তবুও কেন এই অনাদর? ধনী ব্যক্তি ছিলেন না বলে? আভিজাত্যের মিনারে বাস করতেন না বলে? আমার মনে হয় তাঁর কথা প্রচার করার জন্যে আমাদের মধ্যে কোনও উত্তরাধিকারী তিনি রেখে যেতে ভুলে গেছিলেন। অকৃতদার এই মানুষটির আত্মীয়বর্গ তাঁর মৃত্যুর পর সন্ধান করেছিলেন, শুনেছি, তাঁর সিন্দুকের চাবি। ভবঘুরে মানুষটার আর্থিক জমার ঘরটা ছিল শূন্য। অতএব তাঁরা কেন তাঁর কথা বলবেন! এই প্রচারসর্বস্ব যুগে অতএব এই বিশ্বপ্রেমিক মানুষটি অনাদৃতই থেকে গেলেন! আপনার ঢাক আপনি না বাজাইলে কে বাজাইবে!!

রামনাথ বিশ্বাস জন্মেছিলেন একশো বছর আগে ২৩ চৈত্র রবিবার ১৩০০ বঙ্গাব্দে। জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ্গ গ্রাম। আবার বসুমতী-প্রকাশিত 'ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের গ্রন্থাবলী'-তে সংযুক্ত জীবনীতে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে তাঁর জন্ম ১৩০০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের ২৯ তারিখে। তাঁর জন্ম হয়েছিল কাত্যায়ন বংশে। কাত্যায়ন বংশের কথা লিখেছিলাম একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। কারণ রামনাথ বিশ্বাসের পিতা বিরজানাথ বংশের গৌরবটা বিশেষ করে মনে রাখতেন, যেহেতু তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ। একথা মনে করলেই প্রবল বিস্ময় জাগে কি করে এই গোঁড়া বংশের ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও রামনাথ কি প্রবল আত্মশক্তিতে এইসব গোঁড়ামি বিসর্জন দিয়ে এক বিশ্বজনীন ধর্মের উপাসক হয়ে উঠেছিলেন। একশো বছর আগে এটা তো বিপ্লবেরই সামিল ছিল।

ছোটবেলাতে দারুণ রুগ্ন ছিলেন রামনাথ। প্রথমে টাইফয়েড এবং পরে কলেরাতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনীশক্তির ক্ষয় ঘটেছিল। পড়াশোনা শুরু করতে তাই দেরি হয়ে যায় অনেক। আট বছর বয়সে পড়া শুরু করে শুধু অক্ষরপরিচয় করতেই পুরো একটা বছর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরেই হঠাৎ করে কেমন যেন মাথা খুলে যায় এবং পড়াশুনোয় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। এর মধ্যে কোন্‌ ছোটতেই বাবা মারা গেছেন। মা-ও তাই। দাদা-বৌদির যত্ন-আত্তিতে বড় হয়ে ওঠেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকেই তিনি দেশকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। অল্প বয়সেই অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বগ্রামের সুশীলকুমার সেনের কাছে স্বদেশপ্রেমের পাঠ নিতে থাকেন।

কিন্তু যাঁর মা-বাবা থাকেন না, তাঁকে ভাবতে হয় নিজের কথা বিশেষ করে, বেশি করে। অন্নচিন্তা চমৎকারা। অতএব অর্থোপার্জন করতে হবে। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা ধ্বনি ভারতেও এসে বাজতে শুরু করেছে। ফলে তৈরি হয়েছে বাঙালি পল্টন ও লেবার কোর। রামনাথ তাতে নাম লেখালেন। কিন্তু টাইফয়েড আর কলেরায় ভোগা নিম্নমধ্যবিত্তের সন্তানের ওজন কম হয়ে গেল প্রার্থিত একশো পাউন্ডের নিচে। অতএব, বড়বাবু রামনাথ বিশ্বাসের চাকরি গেল কয়েকমাস পরেই। পুনর্বার বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু ঐ যে কথায় বলে, উদ্যোগী পুরুষসিংহদের লক্ষ্মীদেবী একটু বেশি স্নেহ করেন। উদ্যোগী রামনাথ ১৯১৭ সালে পুনরায় কামটিতে সংরক্ষিত কেরানি ও অফিসার স্কুলে ট্রেনিং-এ যোগ দেন। ভাগ্যিস দিয়েছিলেন, কারণ এখানেই তাঁর অতি-প্রার্থিত ভূপর্যটকের জীবন শুরু হবার সুযোগ ঘটে গেল। ট্রেনিং-এর সুবাদে তাঁকে ঘুরতে হল বিভিন্ন স্থানে — বেলুচিস্থান, আফগান এবং পারস্যেও। কিন্তু রোগা একটা বাঙালির পক্ষে এই ট্রেনিং-এর কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় রামনাথ যেন একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তার উপর সে সময়ের ভয়াবহ ম্যালেরিয়াও তাঁকে বিপর্যস্ত করে দিল। ছেড়ে দিলেন সে কাজ। বাড়ি চলে এলেন ১৯২৪ সালে। কিন্তু একটা নেশা তখন তাঁকে ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করেছে — বেড়ানোর নেশা।

অতএব — থাকবো না আর বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে! একটু সুস্থ হতেই সেই বছরেই মালয়ে চলে আসেন এবং সিঙ্গাপুরের জাহাজি-আদালতে ত্রি-ভাষী (ইংরেজি-মালয়ি-চীনা) সুপারভাইজারের কাজ নিলেন। দেশ বেড়াবার সূত্রে এগুলো একটু করে রপ্ত করে নিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের জুলাই মাস অবধি মালয়ে চাকরি করলেন। এই সময়ে তাঁর রক্তের মধ্যে দেশপ্রেমের যে প্রবাহটুকু অন্তঃশায়ী ছিল তার ধীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। গৌরীশঙ্কর সিংহরায়ের মতো বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এলেন তিনি, তাঁদের বাসায় ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগলেন। 'যুগান্তর' দলের সঙ্গেও যোগ ঘটল। এই গৌরীশঙ্করই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সিংহদ্বারটিকে উন্মোচি করে দিতে চেয়েছিলেন ১৯২৬ সালে বিশ্ব পর্যটনে রামনাথকে উৎসাহিত করে। কিন্তু অজয় নামে গৌরীশঙ্করের এক সাগরেদ গোপনে পুলিশে খবর দিয়ে রামনাথের সঙ্গে স্বদেশীদলের যোগাযোগের কথা জানিয়ে দেয়। ফলে চাকরি যায় রামনাথের। আবার পথই হল তাঁর সঙ্গী। তখনই ভাবলেন

সাইকেলে বিশ্ব পর্যটনের কথা। চাকরি ছেড়ে দেবার পর এমন একটা অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল — যা তাঁকে আলো দেখাল। মেরিন কোর্টের কাঠগড়ায় একদিন দুই অভিযুক্ত যুবককে দেখতে পেলেন — তারা বিনা টিকিটে ভ্রমণ করছিল। তাহলে তো অর্থহীন হয়েও দেশ বেড়ানো যায়। তাঁর অন্তরাত্মা বলল, পথেই এবার নামো পথিক। ৬ জুলাই ১৯৩১ একটি বাই-সাইকেল নিয়ে রওনা হলেন কুইন স্ট্রিটের বাঙালি মসজিদ থেকে দুপুর দু'টোয়। সাইকেল ছাড়া তাঁর সঙ্গী হল একটি খদ্দরের চাদর আর একজোড়া চটি।

সিঙ্গাপুর থেকে রওনা হয়ে প্রথমে গেলেন মালয়েশিয়া। শ্যাম, ইন্দোচীন এবং চীন এভাবে ভ্রমণান্তে কোরিয়া ও জাপানে পৌঁছলেন। জাপান ভ্রমণ শেষে কানাডা আসেন। কানাডা সরকার তাঁকে বন্দী করে ভারকোভার জেলে ২৯ দিন রেখে দেয় ও পরে ফের জাপানি জাহাজ হিয়েমারুতে বসিয়ে দিয়ে বলে — 'যথা ইচ্ছা তথা যাও।'

জাপান সরকার মাত্র চারদিন জাপানে থাকতে দিয়ে তাঁকে চীনের সাংহাই বন্দরে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে রামনাথ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করে বালীদ্বীপে পৌঁছান। এক মাস রইলেন সেখানে। সেখানে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে এবার এলেন জাভাতে। তখনকার ডাচ সরকার তাঁকে কয়েদ করে পাঠিয়ে দেয় সিঙ্গাপুরে। তবে তাঁরা অন্য ক্ষতি কিছু করেনি। সিঙ্গাপুর তাঁর পুরনো জায়গা। মাস দু'য়েক এখানে বিশ্রাম নিয়ে তিনি পুনশ্চ বের হলেন পৃথিবী পর্যটনে।

এবার গেলেন পশ্চিমদিকে। সিঙ্গাপুর থেকে রেলে পিনাং এসে সেখান থেকে জাহাজ করে নামলেন বার্মার মারই বন্দরে। তারপর টানা ব্রহ্মদেশের মধ্যে অতিপাতি ভ্রমন। এরপর মণিপুরে। দেশে এসে সেরে নিলেন সমগ্র ভারতভ্রমণ। আবার পুরনো জায়গা আফগান, পারস্য সেরে একে একে দেখলেন ইরাক, সিরিয়া, লেবানন। তারপর তুর্কী হয়ে পা দিলেন ইউরোপের ভূখণ্ডে। তারপরে যেন চক্রাকারে ঘুরতে লাগলেন। দেখা হল আমেরিকা, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, আফ্রিকা, চেক, জার্মান, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স। এবার এলেন ইংল্যান্ডে। অতিভ্রমণে শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন। আর যে পারছেন না। তাই চলে এলেন স্বদেশে — বোম্বাই-এর মাটিতে।

কিন্তু বিশ্ব যাঁকে ডাক দিয়েছে আত্মীয়তার, তিনি কি ঘরে বসে থাকতে পারেন। এখনও যে অনেক দেশ দেখা বাকি। তাই মাত্র ছ'মাসের বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন। বোম্বাই থেকে জাহাজে করে প্রথমে এলেন বোম্বাসা শহরে। পরে পরে কেনিয়া, উগ্যান্ডা, টাঙ্গানিয়াকা, ট্রান্সভাল, নাটাল এবং কেপটাউন ভ্রমণ শেষে জাহাজে করে পুনশ্চ এলেন লন্ডনে। এরপর আমেরিকা, কানাডা হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ১৯৪০-এর এপ্রিলে ফিরে এলেন কলকাতায়। ততদিনে পঞ্চাশ হাজার মাইল পর্যটন শেষ হয়ে গেছে। নিঃসম্বল মানুষটি যখন ঘুরে এলেন তখনও তাঁর পকেট শূন্য। তিনি বিশ্বাস করতেন সঞ্চয় প্রবৃত্তি পর্যটকের সর্বনাশ করে। তাই তিনি ধনী হতে চাননি কখনও।

কিন্তু তাঁর জমার ঘর কি তাই বলে শূন্য হয়ে ছিল ? আদৌ না। তাঁর যে অভিজ্ঞতার ঘর পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তার উত্তরাধিকার পেয়েছিল তাঁর রচনাবলীর অসংখ্য পাঠক। দেশে ফিরে এসে তিনি বাস করতে শুরু করলেন ১৫৬ আপার সার্কুলার রোডের একটি দোতলা বাড়িতে। হরি সা মার্কেটের এই বাড়ির এখন যেখানে জনতা কেবিন, তার উপর তলাতেই রামনাথের বসবাস, সঙ্গী শুধু এখানকার চায়ের দোকানের মালিক বৃদ্ধ রঞ্জিত সাহা। এখানে এসে স্থাপন করলেন সারা ভারত পর্যটক সমিতি। 'পর্যটক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে তার সম্পাদক হলেন তিনি। আর সেই সুবাদে হয়ে উঠলেন বিশ্বভ্রমণের এক বিখ্যাত লেখক। নিজেই নিজের বই ছাপতে শুরু করলেন। ১৫৬ আপার সার্কুলার রোডের ঠিকানায় লটকে দিলেন একটা সাইনবোর্ড — 'পর্যটক প্রকাশ ভবন'। বই বের হল 'আজকের আমেরিকা' ১৯৫১ সালে। এখান থেকে পরে পরে আরও প্রকাশিত হয়েছে লালটীন (১৯৪৩), প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি (১৯৪৫), ঘিচক্রে কোরিয়াভ্রমণ (১৯৪২) প্রভৃতি বই। এসব বই-এর জনপ্রিয়তা দেখে বিভিন্ন প্রকাশক সোৎসাহে এগিয়ে এসে তাঁর বইপত্র প্রকাশ করেছেন। যেমন পপুলার প্রিন্টার্স ওয়ার্কস (তরুণ তুর্কী — ১৯৪১), মিত্রালয় (হলিউডের আত্মকথা — ১৯৪১), ভট্টাচার্য অ্যান্ড সন্স (সর্বস্বাধীন শ্যাম — ১৯৪৯, মালয়েশিয়া ভ্রমণ — ১৯৪৯), অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির (ব্রহ্মদেশে ছয়মাস — ১৯৫৪), অশোক পুস্তকালয় (আফগানিস্তান ভ্রমণ), ডি এম লাইব্রেরি (নাবিক — ১৯৫৪), মিত্র ও ঘোষ (পৃথিবীর পথে, জার্মানি এবং মধ্য ইউরোপ — ১৯৪৮) প্রভৃতি।

ভ্রমণ-কাহিনী ছাড়া তিনি ভ্রমণমূলক উপন্যাস এবং গল্পগ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। একসময়ে তাঁর হলিউডের আত্মকথা, আগুনের আলো অথবা সাগরপারে উপন্যাস যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। তেমনি সমাদর কুড়িয়ে নিয়েছিল 'ভবঘুরে সিরিজে'র বইগুলি — ভবঘুরের বিলাতযাত্রা, ভবঘুরের গল্পের দেশে, ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ প্রভৃতি। 'গৌরীশঙ্কর সিংহরায় কবিত ও রামনাথ বিশ্বাস কর্তৃক লিখিত' 'ভবঘুরের বিলাতযাত্রা'ও এই সিরিজের বই। এই সিরিজটি তিনি লিখেছিলেন মুখ্যত 'ছেলেদের' জন্যেই। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — 'আমার ভবঘুরে জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়। এ শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়ের ভাগ আর কাউকে না দিয়ে দিতে চাই আমার এ-দেশের ছোট বন্ধুদের। তারা বড় আপনজন।'

এহেন লেখকের বইয়ের দীর্ঘতালিকা দিয়ে তাঁর রচনার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না যেমন, তেমনি তাঁর বিশেষত্বটুকুও তাতে ধরা পড়ে না। কী আছে রামনাথের বইগুলিতে, যার ফলে অজস্র পাঠকের অবসর সময়কে সেগুলি কেড়ে নিত ? রামনাথের বই থেকে ইতস্তত কিছু মন্তব্য উদ্ধার করে তাঁকে বোঝার চেষ্টা করছি। একালের পাঠকও হয়ত তাতে উৎসাহিত বোধ করতে পারেন।

(ক) জাপান ভ্রমণের ভূমিকা : 'আজ আমি স্পষ্ট করে বলছি, আমি পৃথিবীর যত স্থানেই গিয়েছি সর্বত্রই পদদলিত নিপীড়িত এবং প্রগতিশীলদের দ্বারাই গৃহীত হয়েছি। ধনীরা আমাকে যেমন ঘৃণা করেছে, আমিও তাদের তেমনি এড়িয়ে চলেছি। জাপানেও সেইরূপ হয়েছে। একটি জাপানী ধনীও আমাকে সাহায্য করেনি, বরং ভিক্ষা করি বলে ঘৃণা করেছে। ... জাপানের প্রগতিশীলেরা আমাকে ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক ভেবে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছিল। পরে যখন জানতে পেরেছিল আমি দরিদ্রশ্রেণীর লোক, তখন তারা আমার সঙ্গে মিশেছিল এবং খোলামনে কথা বলেছিল। ... প্রগতিশীল বলতে অনেকেই কমিউনিস্ট মনে করেন, আমার মনে হয় না, জাপানীরা তাদের রাজভক্তি এবং জাপানী জাতই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত, অতি সহজে ভুলতে পারবে। যাঁরা এই দুই মত পরিত্যাগ করেছেন এবং পৃথিবীর সকল মানুষকেই সমান মনে করেন, সেই জাপানীদেরই আমি প্রগতিশীল মনে করেছি।' এই বইটি তাই 'প্রগতিশীল' জাপানীদের উদ্দেশেই উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

(খ) 'আমেরিকার নিগ্রো' গ্রন্থে নিগ্রো-নিগ্রহ দেখে লিখেছেন (১৯৪০) — 'ভেবেছিলাম, এমন বর্বরতা লোপ করার জন্য আমেরিকাতে থেকে যাই এবং নিগ্রোদের দলে মিশে বর্বরতা উচ্ছেদের চেষ্টা করি।' আসলে ব্রিটিশ প্রজার পক্ষে পরাধীন দেশে বাস করে এই চেষ্টা ফলবতী হবে না ভেবেই বই লিখে বিশ্বের দৃষ্টিকে নিগ্রোদের অবস্থার প্রতি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। 'দুনিয়া জুড়ে অবহেলিত, অত্যাচারিত, দুঃখী কালো মানুষকে' তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। তাই বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা আছে : 'নিগ্রোজাতির মুক্তির জন্য যিনি প্রাণ দিয়েছিলেন/ সেই মহামতি আব্রাহাম লিনকনের/ স্মরণে 'আমেরিকার নিগ্রো'/ নিবেদিত হইল।'

(গ) বিদ্রোহী বলকান দেশে তাঁর আত্মপরিচয়ের বাধা : 'আমি ন্যাশনালিস্ট না কমিউনিস্ট ? আমি মাত্র হিন্দু। কারণ যাদের স্বাধীনতা নেই তাদের এসবের বালাই নেই। আমরা সর্বপ্রথম স্বাধীন হই, তারপর দলের কথা ঠিক করব।'

(ঘ) স্বদেশী সুখী মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য — 'আমাদের দেশের মধ্যবিত্তরা বেশ আরামে আছে। মাঝে মাঝে স্বদেশী করে, কেউ জেলে যায়, কেউ মরে, আর কেউ সংবাদ পড়ে আনন্দ করে। তবে আমাদের দেশের মধ্যবিত্তরা সাহিত্যে বেশ মন দিয়েছে — এবার তাদের উন্নতি হবেই।'

(ঙ) ছাত্রদের সম্পর্কে তাঁর কথা : 'যে দেশের ছাত্ররা যত উন্নত, সেই দেশের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থাও তত ভাল। আমাদের দেশের ছাত্রদের আত্মবলিদানে এবং নেতাদের আপ্রাণ চেষ্টায় আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি সত্য কথা, কিন্তু শিক্ষার দিকেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে'— ভবঘুরের ভিনদেশী বন্ধু।

আসলে তাঁর জীবনে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎকার ঘটেছে। যে দেশ তাঁকে অসম্মানে ঠেলে দিয়েছে, তারাই পুনশ্চ তাঁকে সসম্মানে আহ্বান করেছে। যারা এক সময়ে কৃতার্থ হয়েছে, তারাই আবার তাঁকে বিদ্রূপও কম করেনি। একবার লন্ডন ভ্রমণকালে সস্তায় ঘর ভাড়া পাবার জন্য তিনি দেখেন অন্তত দুশো জায়গায় ভাড়ার বিজ্ঞাপন ঝুলছে। কিন্তু তাঁকে দেখেই সবাই বলেন, 'এইমাত্র সব ঘরই ভাড়া হয়ে গেছে, দুঃখিত।' বাধ্য হয়ে রামনাথ বললেন, 'বিজ্ঞাপনটি যদি উঠিয়ে দিতেন তাহলে আমাকে কষ্ট করতে হতো না।' কালা আদমির জন্য কি ঘর থাকতে পারে!

সৎ এবং সত্যতার সংগ্রামী রামনাথের ভ্রমণ কাহিনী ছিল, তাঁরই ভাষায় — 'আমার এ গল্প গল্প নয়, জীবনবেদ। থেকে থেকে মনে হয় পৃথিবীর তাবৎ লোককে যদি দেখাতে পারতাম — জগতের সকল দেশ। তা ত' হয় না। সেজন্য লিখতে চাই, বলতে চাই — আমার বাসনার সেরা স্বপ্ন কি ?' আফ্রিকা যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন — 'দেখো রামনাথ, নিগ্রো চরিত্রে যা ভাল দেখবে তাই বয়ে আনবে।' কিন্তু নিগ্রোদের অবস্থা দেখে যন্ত্রণাকাতর রামনাথ সত্যই মন্তব্য করেছেন — 'নিগ্রো চরিত্রে কী আর ভাল দেখব ? মনিব থেকে গোলাম পর্যন্ত সবাই নিগ্রো-নির্যাতনে পরম উৎসুক।' একটু মনুষ্যত্বের জাগরণকে বিশ্বব্যাপী করে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন বলেই কলমকে হাতিয়ার করে নিতে পেরেছিলেন তিনি। অপমান, লাঞ্ছনাকে তাই তিনি সহজেই অবহেলা করতে পেরেছিলেন। সেই কলমে তাই অতিশয্য ছিল না, সজ্ঞা বা পারিপাট্য ছিল না, অলঙ্কার-বহুল স্বপ্নালুতা ছিল না। তাই 'আজকের আমেরিকা'র লিখেছেন — 'আমি সত্যের সন্ধানে দেশ ঘুরেছি। ভাষা বা সাহিত্যের টেকনিক নিয়ে রঙ মশাল তৈরী করবার অবকাশ পাইনি— ইচ্ছাও তেমন ছিল না। তাই আমার বক্তব্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি যথেষ্ট থাকবার কথা। তবে এটুকু সান্ত্বনা আমার যে, সত্য কথা বলতে কোনদিন আমি ভীত হইনি।' তাই তাঁর বইগুলি নানান জাতির দলিত মানুষদের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে, কল্পনার রঙিন বেলুন হয়ে ওঠেনি। দুনিয়া ঘুরে দু'চোখ দিয়ে তিনি সন্ধান করেছেন মানুষ ও মনুষ্যত্বের। সাধারণ মানুষের এই বন্ধুটিকে আমরা এত দ্রুত ভুলে গেলাম কী করে ?

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি

কমলাকান্ত বরাট

স্বরলিপিকে গানের কাঠামো বলা হয়। এটাই দস্তুর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে-অর্থে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের স্বরলিপিকে কাঠামো বলা হয়, ঠিক সেই অর্থে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিকে কাঠামো বলা যায় কিনা। হিন্দুস্থানি সঙ্গীত এবং নিজের গানের পার্থক্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে যা বলেছিলেন, তা হচ্ছে, "হিন্দুস্থানি সঙ্গীতকার, তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁক রাখি নি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঁচব।"[১] হিন্দুস্থানি সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যসঙ্গীতের মধ্যে যেমন আকাশ-পাতাল পার্থক্য, এদের উভয়ের স্বরলিপির পার্থক্যও ঠিক তেমনই। হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের স্বরলিপিতে গায়কের ভরে দেওয়ার মতো ফাঁক আছে বলেই তা কাঠামো। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিতে গায়কের ভরে দেওয়ার মত বিন্দুমাত্র ফাঁক নেই। সুতরাং সঙ্গত কারনেই প্রশ্ন ওঠে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিকে কাঠামো বলা হবে কেন?

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিতে গানের সুরের প্রতিটি অংশই ধরা থাকে অর্ধ মাত্রা এমনকি সিকি মাত্রায়। এর সঙ্গে আছে ছন্দ, মীড় এবং স্পর্শ স্বর — এক কথায়, কী নেই। স্বরলিপির মাধ্যমে শিক্ষার্থী অথবা শিল্পী নিজের শিল্পমানসিকতার সাহায্যে গানটিতে প্রাণ সঞ্চার করবেন এবং গানটিকে রসোত্তীর্ণ করে গাইবেন, এটাই নিয়ম। যাঁরা স্বরলিপি থেকে গান তুলতে অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে অধিকাংশ গানের সার্থক রূপায়ণ মোটেই কঠিন নয়। এই প্রসঙ্গে সুবিনয় রায়ের বক্তব্য: "সুর-তালের বিশদ গীতরূপটি ও সেই সঙ্গে গীতরীতির বা গায়নপদ্ধতির ইঙ্গিতটিও প্রকাশিত স্বরলিপির মধ্যে আমরা পাই। এই ইঙ্গিতটি প্রতিটি গানে স্বরলিপি থেকে বুঝে নেওয়া ও সেই অনুযায়ী যথার্থ গীতরূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্য চাই দীর্ঘ সাধনালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। তবে এ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় এবং অনেকেই তা করেছেন। স্বরলিপির উপরে বেশী নির্ভর করলে গান নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে এ-কথা রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় বোধ হয় সম্পূর্ণ ঠিক নয়, কারণ, একটু আগেই বলেছি, — রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিগুলি গীতরীতির আভাষ-ইঙ্গিত বহন করে"।[২]

বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ দেশের স্রষ্টাগণ একাধারে গান রচয়িতা এবং সুরকার। জয়দেব থেকে নজরুল পর্যন্ত সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাচীন যুগের রচয়িতাদের মূল সুরগুলি সংরক্ষণের অভাবে আজ বিস্মৃতির গর্ভে অবলুপ্ত। বিভিন্ন গায়কের স্বেচ্ছাচারের ফলেই যে গানগুলির সুরবৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। বর্তমানে সুরসংরক্ষণের বিভিন্ন প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে যার মধ্যে স্বরলিপিই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ উপায়। সুরসংরক্ষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমাদের দেশে ভালো স্বরলিপি ছিল না, রাগ-রাগিনীর নাম অসম্পূর্ণরূপে স্বরলিপির কার্য সাধন করিত। কিন্তু এখনো সেই অসম্পূর্ণ সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ অসুবিধা ভোগ করিবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। ইংরাজি স্বরলিপি গ্রহণ করিতে দোষ নাই — তা, না হয় তো নূতন স্বরলিপি নির্মাণ করা হউক।"[৩] বলা বাহুল্য, সেই নূতন স্বরলিপি নির্মাণ করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে বর্তমানের আকারমাত্রিক স্বরলিপি। সুরসংরক্ষণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ যিনি তাঁর গানের ওপর, অপরের হস্তক্ষেপ রুখতে 'বোড্' গঠন করে এক অনন্যপূর্ব নজির স্থাপন করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা মোটামুটি সফল বলা যায়, আর এটা সম্ভব হয়েছে স্বরলিপি ছিল বলেই।

আকারমাত্রিক স্বরলিপি ঠাকুরবাড়িরই অবদান। "জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে শোভন সোম লিখেছেন, "বালক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় আঠারো শো পঁচাশিতে প্রতিভা লিখিত সহজে গান শিক্ষা বিষয়ক নিবন্ধে উল্লেখ আছে যে এই স্বরলিপির সংকেত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই চিহ্নাবলী প্রকাশিত হবার পর এই পদ্ধতির অল্প-বিস্তর পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ অনুসারে ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী, বালক, সাধনা ইত্যাদি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সঙ্গীতরচয়িতাদের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হতে থাকে। তারপর এই সঙ্গীতলিপি পদ্ধতির বিশেষ রূপ দেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তেরো-শো চারে, (আঠারোশো সাতানব্বইতে) তাঁর সংকলিত ও ব্যাখ্যাত স্বরলিপি গীতিমালায় তিনি 'আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি' নামে এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। আকার দ্বারা মাত্রার ওজন বোঝাবার কারণে এই নতুন বাংলা স্বরলিপি পদ্ধতির নাম আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি"।[৪] আলোচ্য প্রবন্ধের অতিরিক্ত তথ্য অনুযায়ী স্বরলিপি আবিষ্কারের সঠিক সময় হচ্ছে ১৮৬৯ সাল। কাজেই, দ্বিজেন্দ্রনাথের সময় থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছরের সময়কালকেই আকারমাত্রিক স্বরলিপির বিবর্তনকাল বলা যায়।

অনেকের মতে ইউরোপীয় স্বরলিপির তুলনায় আমাদের স্বরলিপি নাকি তেমন উন্নত নয়। হয়ত তাই হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি আমাদের স্বরলিপি থেকে গান তুলে দিব্যি গাওয়া যায়। স্বরলিপি সম্বন্ধে দিলীপকুমার রায়ের অভিমত প্রসঙ্গে

রাজেশ্বর মিত্র বলেছেন, "আকারমাত্রিক স্বরলিপিকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, কেননা কাব্যসঙ্গীতের পক্ষে এই প্রথার স্বরলিপি সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত।"[৫] নির্মুতভাবে গান তোলার পক্ষে স্বরলিপি যখন অপরিহার্য, তখন তাকে কাঠামো বলা হবে কেন, তা বোঝা সত্যিই কঠিন। স্বরবিতান খোলার সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি গ্রামোফোন-রেকর্ডের মত গান হুয়ে বেজে ওঠে না, কেবলমাত্র এই কারণেই কি স্বরলিপিকে কাঠামো বলতে হবে? স্বরলিপি ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা এক কথায় অকল্পনীয়। গান-বাজনার সামান্য চর্চা আছে, এমন যে কোনও বাঙালি বাড়িতেই দু-চারখানা স্বরবিতান দেখা যায়। দুঃখের বিষয়, এত গুণ থাকা সত্ত্বেও স্বরলিপি তার প্রাপ্য প্রশংসাটুকুর কণামাত্রও পায় না। তবে এ-কথা খুব সত্যি যে, স্বরলিপি ছিল বলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে — না থাকলে যে কী হত, তা ভাবতেও ভয় লাগে।

বলা হয়, সঙ্গীত গুরুমুখী বিদ্যা, গুরুর কাছে না শিখলে গান শেখা যায় না। প্রশ্ন হচ্ছে, সংসারে কোন্ বিদ্যা গুরুমুখী নয়? কিন্তু শিক্ষার অর্থই তো স্বশিক্ষা। শিক্ষার্থীর কাছে গুরু-প্রদর্শিত পথে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাবার বাধা কোথায়? দুর্ভাগ্য সেই ছাত্রের যাকে চিরকাল গুরুমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, আর তার চেয়ে বেশি দুর্ভাগ্য সেই গুরুর যাঁকে জীবনভর তাঁর ছাত্রের হাত ধরে নিয়ে যেতে হয়। শুনে শুনে কখানা গান শেখা যায় এবং শিখেই বা কতদিন মনে রাখা যায়? স্বাধীনভাবে এবং ইচ্ছামত গান গাইতে হলে স্বরলিপি ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই। বস্তুত এমন কিছুই নেই যা স্বরলিপিতে নেই। দুঃখের বিষয়, স্বরলিপি দেখে গান করেন এবং গান শেখান এমন অনেকেই বলেন, 'স্বরলিপিতে এটা নেই, ওটা বোঝা যায় না, লয়ের কোনো নির্দেশ নেই'... ইত্যাদি। মজার কথা, এঁরা নিজেরা কিন্তু প্রয়োজনীয় যা-কিছু-সব স্বরলিপি থেকেই পেয়ে যান। গানের ভাব এবং ছন্দের মধ্যেই গানটির লয় নিহিত থাকে। 'আষাঢ় কোথা হতে আজে পেলি ছাড়া' গানটি বিলম্বিত লয়ে গেয়ে, যিনি 'আবার এসেছি আষাঢ়' গানটি দ্রুত লয়ে গাইবেন, তাঁর জন্য অবশ্যই রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি আকারে খুব ছোট আর বর্তমানে রেকর্ড-রেডিও-টিভি.র যুগে গানগুলি শোনার যখন প্রচুর সুযোগ রয়েছে, তখন কোনও সমস্যাই স্বরলিপি থেকে গান তোলার পক্ষে প্রতিবন্ধক বলে গণ্য হতে পারে না।

গান সম্বন্ধে যাঁর কিছুমাত্র ধারণা নেই, এমন লোকের কাছে স্বরলিপি কেবল কতকগুলি অর্থহীন সাংকেতিক চিহ্ন এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু অক্ষর ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যাঁরা স্বরলিপি থেকে গান তুলতে পারেন, তাঁদের কাছে একমাত্র স্বরলিপিই গান, কারণ, নির্খুত গান কেবল স্বরলিপি থেকেই পাওয়া যায়। স্বরলিপিতে গায়নপদ্ধতির নির্দেশ থাকে না, এমন মন্তব্য শুধু ভুলই নয়, আপত্তিকরও বটে। স্বরলিপি কখনই গ্রামোফোন রেকর্ডের মত গান হয়ে বেজে উঠবে না। শিক্ষার্থীকে স্বরলিপির অন্তর্নিহিত আভাস-ইঙ্গিতগুলিকে পরিস্ফুট করে গানটিতে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে এবং গানটিকে রসোত্তীর্ণ করে গাইতে হবে। অনেকের মতে স্বরলিপির ওপর খুব বেশি নির্ভর করলে গান নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। বাস্তবে কিন্তু উল্টোটাই দেখা যায়। স্বরলিপির ওপর একান্ত নির্ভরশীল না হলেই বরং গানটি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। নির্খুতভাবে স্বরলিপি অনুসরণ না করলে গানের নির্দিষ্ট একটি অংশ যে বিশেষভাবে বিকৃত হয়ে পড়ে এটা পরীক্ষিত সত্য।

দীর্ঘ দিনের সাধনালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়া স্বরলিপি থেকে গান তোলা সহজ নয় বলাই বাহুল্য। প্রতিটি মাত্রা গুনে গুনে গোটা একটা গান নির্খুতভাবে তোলার কাজ নি:সন্দেহে অত্যন্ত বিরক্তিকর ও ক্লান্তিজনক। শুধু ধৈর্যের অভাবেই অনেকে এ কাজ ছেড়ে দেয়, এ কথা অনেক ক্ষেত্রেই সত্যি। ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, সব বাধা অতিক্রম করে গান রূপায়ণের তীব্র উদ্দামনায় যিনি চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন, তাঁর কণ্ঠেই শেষ পর্যন্ত বেজে ওঠে একটি নির্খুত রসোত্তীর্ণ গান, — অবশ্য শুধু তাঁর কণ্ঠেই, যিনি নিজের শিল্পমানসিকতার সাহায্যে গান রূপায়ণ করতে পারেন। কেউ তা না পারলে স্বরলিপির কোনও অপরাধ নেই, কিছুতেই তাকে কাঠামো বলা যাবে না। স্বরলিপি থেকে গান তোলা আসলে এক ফুল-ফোটানোর খেলা, যা সকলের জন্যে নয়। সকলেই সব-কিছু পারে না — 'যে পারে সে আপনি পারে'।

তথ্যসূত্র

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — সঙ্গীতচিন্তা, সংস্করণ ১৩৯২, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭
২। সুবিনয় রায় — 'রবীন্দ্রচর্চা', রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন প্রবন্ধাবলী ১৯৭৪-৭৫, Tagore Research Institute.
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — সঙ্গীতচিন্তা, সংস্করণ ১৩৯২, পৃষ্ঠা ২১
৪। শোভন সোম — প্রবন্ধ: জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতি, দেশ পত্রিকা — ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৮
৫। রাজেশ্বর মিত্র — প্রবন্ধ: সুরসুধাকর দিলীপকুমার, দেশ পত্রিকা — ১২ জানুয়ারি, ১৯৮০

প্রসঙ্গ ধর্ম ও রাজনীতি (১)

চৈত্র ১৪০০ সংখ্যার পত্রিকায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আবদুর রউফ সাহেবের সময়োপযোগী প্রবন্ধ তিনটি প্রকাশ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু বক্তব্য নিবেদন করছি।

স্বামীজীর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করতে অসুবিধা নেই যদি মনে রাখা যায় যে 'ধর্ম' বলতে তিনি যে নৈতিকতা ও এমন কি আধ্যাত্মিকতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা 'ধর্ম'-কে যাঁরা রাজনীতি থেকে পৃথক করার দাবি জানান, তাঁদের ব্যবহৃত 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ থেকে ভিন্ন। লোকেশ্বরানন্দজীর কাছে এটা নিশ্চয়ই বিদিত যে ইংরেজি রিলিজিয়ন শব্দের (যার অনুবাদ আমরা 'ধর্ম' শব্দটির দ্বারা করে থাকি) চেয়ে সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ ও ব্যঞ্জনা অনেক গভীর। মহাভারতে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম-সংবাদে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আধুনিক যুগের প্রাক্কালে যে ইউরোপে 'রিলিজিয়ন' থেকে রাজনীতিকে ('চার্চ' থেকে 'স্টেট'— মূল শব্দ দু'টি ব্যবহার করলে বোধ হয় এই বিভ্রান্তি এড়ানো যায়) পৃথক করার দাবি উঠেছিল, সেখানে 'রিলিজিয়ন' শব্দটির তাৎপর্য ছিল sect বা পন্থের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান। আজকের পরিভাষায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি নানা সাম্প্রদায়িক বা তাদের উপাঙ্গের 'ধর্ম'। আজকের ভারতে যে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরা রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করার কথা বলেন, সে 'ধর্ম' সম্প্রদায় বিশেষ বা পন্থের ধর্ম। যাবতীয় ধর্মমতের সারাৎসার যে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি স্বামীজী ইঙ্গিত করেছেন, তাকে বর্জন করার কথা অধিকাংশ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরা বলেন না। তাঁদের বক্তব্য পত্রিকার এই একই সংখ্যায় আবদুর রউফ সাহেব 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেকুলার ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। সংক্ষেপে — 'আমাদের দেশে সেকুলারিজমের ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটাতে হবে অন্তত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনরকম প্রশ্রয় প্রদান চলবে না। ... পুরোপুরি ইউরোপীয় মডেলের সেকুলারিজম এখানে চলবে না। এই সেকুলারিজম হবে নিঃসন্দেহে রাবীন্দ্রিক। যেখানে মানবকল্যাণ চিন্তার সঙ্গে অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে শিব এবং সুন্দরের সাধনার।' রাজনীতি বা রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা যদি এই পন্থের বা সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রভাবমুক্ত হতে না পারে তবে ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocratic state) এড়ানো যাবে না। আর সে অবস্থায় গণতন্ত্র, বিজ্ঞান, যুক্তিবাদী মুক্তবুদ্ধির চর্চা ইত্যাদির বিলুপ্তি দূরস্থ নয়। এছাড়া সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির অনুগামীদের মধ্যে রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্বের প্রশ্নে মারামারি ও হানাহানির দ্বারা আধুনিক রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের পরিসমাপ্তিও অবধারিত। এই কারণে স্টেট থেকে চার্চের অর্থাৎ প্রচলিত ভাষায় রাজনীতি থেকে ধর্মের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ বা ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্যব্যবস্থা ও রাজনীতি বাঞ্ছনীয়।

অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ম ও রাজনীতি উভয়েরই যুগোপযোগী সংস্কার-প্রস্তাব খুবই বাস্তব। 'ব্যাপক বিজ্ঞানমুখী গণশিক্ষা ও গণ চেতনা'-তে তিনি যে মানবমুক্তির পথনির্দেশ করেছেন তা আশাব্যঞ্জক। তাঁর নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্যও খুবই যুক্তিযুক্ত : 'মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে অগণতান্ত্রিক জবরদস্তির মাধ্যমে সরাসরি আঘাত না করে সে বিশ্বাসের মধ্য থেকে যদি সাম্য ও যুক্তির আদর্শের নির্যাস বের করে আনা যায় আর ধর্মের নামে সে বিশ্বাসকে দলিত-শোষিত শূদ্র মানুষের মুক্তির রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে বিদ্রোহে প্রতিরোধে বিপ্লবে ব্যবহার করা যায়, তবে বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে আপত্তি করার বিশেষ কারণ থাকতে পারে না।' অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অতীব সঙ্গত কারণে ভোট ব্যাঙ্ক গড়ার মানসিকতা-চালিত ডান-মধ্য-বাম তাবৎ রাজনৈতিক দলের সীমাবদ্ধতা দৃষ্টে হতাশ হয়েছেন। তাই তাঁর প্রস্তাবিত পন্থায় জনমত গঠনের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য লালায়িত নন এমন সব ব্যক্তিদের সংগঠিত করার কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং এ-বিষয়ে উদ্যোগী হলে অনেক সহযাত্রী পাবেন সন্দেহ নেই।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তিবাদী স্বচ্ছ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের দু'টি গৌণ অঙ্গের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি বলেছেন যে, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রবর্তিত হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও তার দার্শনিক রসে পুষ্ট জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের হিন্দু চরিত্রের প্রতিক্রিয়ার মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির সৃষ্টি। কিন্তু তার অনেক পূর্ব থেকেই প্যান ইসলাম প্রভাবিত মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের অস্তিত্ব এদেশে ছিল। এর প্রবলতম উদাহরণ ওহাবী আন্দোলন যা তার শুদ্ধ শরীয়তী ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন, দার-উল-ইসলাম এবং জেহাদ ও হিজরৎ প্রমুখ ভাবধারা ও কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হবার পূর্ব থেকেই রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের মুখর অংশের মনে পৃথক ইসলামী অস্মিতার সৃষ্টি ও পুষ্টিতে সক্রিয় থেকেছে। এ বক্তব্যের সমর্থনে যেসব উদাহরণ দেওয়া যায় স্থানাভাবের জন্য তা উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকছি। দ্বিতীয় বক্তব্য গান্ধীজি সম্বন্ধে। এক্ষেত্রে তিনি গান্ধীজির অসাম্প্রদায়িক ভূমিকার প্রশংসক হলেও তাঁর বক্তব্যের ভাষা থেকে মনে হতে পারে যে গান্ধীজি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যচালিত হয়ে নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস বা আচার-অনুষ্ঠানের কাজে লাগিয়েছিলেন, গান্ধীজির প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশ্য ধর্মীয় আচরণ অথবা রামরাজ্য প্রমুখ ধর্মীয় ভাষার প্রয়োগ বুঝি তার ধর্মনেতার ভাবমূর্তিকে জনসমক্ষে তুলে ধরে তার রাজনৈতিক লাভ পাবার

প্রয়াস। গান্ধীজি গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। এমন কি তাঁর রাজনীতিতে যোগদান যে এক্ষেত্রের আধ্যাত্মীকরণের জন্য একথাও তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর ভাষা, ভঙ্গী বা প্রকাশ্য আচার-অনুষ্ঠান একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিত্বের অঙ্গ যা গড়ে উঠেছিল বাল্য থেকে যৌবন পর্যন্ত তাঁর পরিবেশ, শিক্ষা ও জীবনযাপনের অঙ্গ হিসাবে। এসব কেউ গ্রহণীয় নয় মনে করতে পারেন, এমনকি অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে বিবেচনা করতে পারেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই ধর্মনিষ্ঠা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বা ব্যবহৃত — এমন ধারণার প্রচারের সহায়ক হলে তা অসত্য এবং একান্ত অসংবেদনশীলতার পরিচায়ক হবে।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কামডহরি, কলকাতা-৮৪

প্রসঙ্গ ধর্ম ও রাজনীতি (২)

৪০০ সালের চতুরঙ্গ-এর গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ধর্ম ও রাজনীতি' নামক প্রবন্ধটি সমকালের স্বদেশীয় প্রেক্ষাপটে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধর্ম রাজনীতির মদতপুষ্ট হয়ে ক্রমশ যে দেশের ঐক্যের ভিত্তিভূমিতে ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে তা ঐতিহাসিক সত্য ও এই সত্যকে তাঁর ঋজু বিশ্লেষণের দ্বারা লেখক পাঠক-সাধারণের সমক্ষে এনেছেন। এ হেন পরিস্থিতিতে সকলের কী করা কর্তব্য, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ব্রতী করতে তিনি পারঙ্গম। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। ধর্ম যতদিন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ না করে কেবল সামাজিক স্তরে পালিত হচ্ছিল, অর্থাৎ পুরোহিত তন্ত্রের প্রাধান্য যখন ছিল সুদূরপরাহত, ততদিন কিন্তু তার শোষণের কোন চেহারা ফুটে ওঠেনি। তা পালিত হওয়ার পশ্চাতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশও ছিল অনুপস্থিত। স্বতঃস্ফূর্ততাই ছিল সেই সমাজধর্মের প্রাণ। সুতরাং রাজনৈতিক কোন প্রভাব তাকে কলুষিত করতে পারেনি। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম শুরু হতেই তা রূপান্তরিত হল শোষণ ও নিপীড়নের যন্ত্রবিশেষে। রাজানুগ্রহে বর্ধিত সেই ধর্মই ক্রমশ তার কালো ছায়ার পক্ষবিস্তারে ঢেকে ফেলেছে সমাজধর্মের অনাড়ম্বর ও সরল ঐক্যের চেহারাটিকে।

অশোক মৈত্র
বি রোড, হাওড়া-৬

বদরুদ্দীন উমরের পত্র

চতুরঙ্গে আমাদের পরিবারের ওপর দু'টি সংখ্যায়* প্রকাশিত লেখাটি দেখলাম। পুরো লেখাটি খুব ঢিলেঢালা মনে হল। তাছাড়া তথ্য সম্পর্কে ভালভাবে খেয়াল না করার ব্যাপারও আছে। শেষ দিকে বাসেত সাহেবকে আহাদ সাহেবের ছেলে বলা হয়েছে। অথচ তাঁরা হলেন সহোদর ভাই। তাছাড়া এক জায়গায় আবার লেখা হয়েছে, মাঝে মাঝে সুহরাওয়ার্দ্দী সাহেব আমার মাকে আমাদের অর্থাভাবের জন্য সাহায্য করতেন। কথাটি একেবারেই ঠিক নয়। তবে আব্বা ভাষা আন্দোলনের সময় যখন জেলে ছিলেন তখন সুহরাওয়ার্দ্দী সাহেব অর্থাৎ আমাদের শাহীদ মামু একবার আমাদের বাসায় এসে আমার মাকে পাঁচ/ছয়শো টাকা দিয়েছিলেন আমাদের সকলের জন্য। এভাবে আত্মীয়স্বজনরা তো কোন বিশেষ সময়ে এক-আধবার টাকা দিয়েই থাকে। তাকে দারিদ্রের কারণে অর্থ সাহায্য বললে সেটা অন্যরকম দাঁড়ায়। মনে হয়, আব্বা তাঁর কোন লেখায়, অথবা In Retrospective-এ এই ঘটনার উল্লেখ করায় লেখক এভাবে লিখেছেন। যাই হোক, তবু একটি লেখা তো এভাবে বের হয়েছে সেটা ভালো।

বদরুদ্দীন উমর
টিকাটুলি, ঢাকা-১২০৩

---

* চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২ (শরৎ ১৪০০) এবং সংখ্যা ৩ (ফাল্গুন ১৪০০)-এ প্রকাশিত 'একটি অগ্রণী বাঙালি মুসলিম পরিবারের চিন্তা-চেতনার ধারা' প্রবন্ধটির কথা পত্রলেখক উল্লেখ করেছেন।

'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা'-র লেখক মৌমাছি নয়

শ্রী সুভাষ বাগচীর সুলিখিত 'আধুনিক বাংলা গান : একটি পর্যালোচনা' মন দিয়ে পড়েছি। চৈত্র, ১৪০০ সংখ্যার পর্বটিতে কিন্তু একটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল। লেখক 'আধুনিক কবিতা নিয়ে আধুনিক বাংলা গান' এই অনুচ্ছেদে লিখেছেন, 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা'-র লেখক বিমলচন্দ্র ঘোষ — মৌমাছি খ্যাত। কিন্তু আমরা জানি এই সুপরিচিত গানটির রচয়িতা মৌমাছি বিমল ঘোষ নন। কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ — সম্পূর্ণ অন্য ব্যক্তি।

প্রবন্ধটি মূল্যবান এবং সময়োপযোগী। আর ভাল লেগেছে এই সংখ্যার মহাদেব সাহার কবিতা।

শৈবাল চক্রবর্তী
ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১